লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী লেখক আহমদুল ইসলাম চৌধুরীর জন্ম ১৯৫০ সালের ১৮ জানুয়ারি দক্ষিণ চট্টগ্রামের বাঁশখালীস্থ খান বাহাদুর বাড়িতে (সাবেক উজির বাড়ি)। পবিত্র আরব ভূমি থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বিশ্বের এতদঞ্চলে আগত মহান হযরত সৈয়দ আবদুর রহমান সিদ্দিকী (র.)-এর বংশধর তিনি। বৃটিশ আমলের দু'দুবারের পার্লামেন্ট সদস্য, উপমহাদেশের অন্যতম খ্যাতিমান জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব আমিরুলহজ্ব খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরীর তৃতীয় পুত্র।

দেশের বহুল প্রচারিত দৈনিক পূর্বকোণে সাপ্তাহিক কলাম লেখা ছাড়াও তিনি ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও ম্যাগাজিনে লেখালেখি করে আসছেন।

জনাব চৌধুরীর এ পর্যন্ত ২৬টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। আরও ১১/১২টি গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকাশিত তার প্রবন্ধের সংখ্যা ৯৫০ ছাড়িয়ে গেছে। এতদ্ব্যতীত, তিনি একাধিক স্মরণিকা / স্মারক গ্রন্থের সম্পাদনা, দিকনির্দেশনা দান করেন।

জনাব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী জীবনের বিভিন্ন সময়ে পারিবারিক ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা নিয়ে ১৪টি ধর্মীয়, শিক্ষা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তৎমধ্যে বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলীয়া মাদ্‌রাসা ও অঙ্গপ্রতিষ্ঠান সমূহ প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৭৬ সাল থেকে।

এতদ্ব্যতীত, তিনি পিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাঁশখালী বৈলছড়ি নজমুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ও ১৯৮৮ সাল থেকে সভাপতি পদে আসীন থেকে বিদ্যালয়ের উন্নয়নে ও সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণে অবদান রেখে আসছেন। তিনি দেশে বহুল পরিচিত সাড়া জাগানো ৭/৮টি সংগঠন দাঁড় করিয়ে মানব কল্যাণে সেবাদান করে আসছেন।

বর্তমানে তিনি দেশের ১০/১১টি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আজীবন দাতা ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, তেমনি তিনি দেশের প্রতিষ্ঠিত ৭/৮টি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের আজীবন সদস্য।

এসবের পরেও তিনি দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক, সভাপতি ও সদস্য হিসেবে জড়িত থেকে সেবা দিয়ে আসছেন।

তিনি এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশের বহু দেশ সফর করেন। তৎমধ্যে ইরান ও তুরস্কে রাষ্ট্রীয় অতিথি হয়ে সফর করেন।

চট্টগ্রাম থেকে হজ্বযাত্রী পরিবহন: ইতিকথা-অধিকার-দাবী

আহমদুল ইসলাম চৌধুরী

পাহাড়তলী হাজী ক্যাম্পে প্রশাসনিক ভবন, বর্তমানে পরিত্যক্ত

শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর

সমুদ্র বন্দর

প্রকাশ ও প্রচারে : হজ্বযাত্রী কল্যাণ পরিষদ

১০ রোজভ্যালী রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া, জাকির হোসেন রোড, চট্টগ্রাম
E-mail : hkp@kbhouse.info, মোবাইল ঃ ০১৭১৩-১১৫৬০১

Chattagram Thekay Hajjatri Poribahan
Etikotha-Odhikar-Dabi

প্রকাশক
হজ্বযাত্রী কল্যাণ পরিষদ
১০ রোজভ্যালী রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া,
জাকির হোসেন রোড, চট্টগ্রাম। মোবাইল ঃ ০১৭১৩-১১৫৬০১
E-mail : hkp@kbhouse.info

প্রকাশকাল
১২ শাবান ১৪৩৪ হিজরি
৮ আষাঢ় ১৪২০ বাংলা
২২ জুন ২০১৩ ইংরেজি

মুদ্রণে
হার্ট অফ মাল্টিমিডিয়া
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ঃ ০১৮১৫-৬২০৮২৫

হাদিয়া : ৫০/-
Price US. $ 1.00

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থ

- তাওয়াফ ও যেয়ারত-১৯৯৮ ইংরেজি (৯ম প্রকাশ) - ২০১২ ইংরেজি
- কালান্তরে দৃষ্টিপাত ১ম ও ২য় খণ্ড - ১৯৯৯ ইংরেজি
- কালান্তরে দৃষ্টিপাত ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড - ২০০১ ইংরেজি
- হজ্ব ও যেয়ারত - ২০০২ ইংরেজি
- গারাংগিয়া হযরত বড় হুজুর (রহ.) - ২০০৩ ইংরেজি (২য় প্রকাশ) - ২০০৪ ইংরেজি
- চট্টগ্রামের কথা - ২০০৪ ইংরেজি
- কালান্তরে দৃষ্টিপাত -৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড - ২০০৪ ইংরেজি
- মক্তুবাতে হামেদী-মজিদী- ২০০৪ ইংরেজি
- গারাংগিয়া হযরত ছোট হুজুর (রহ.) (সেমিনার স্মারক) - ২০০৪ ইংরেজি
- মোবারক স্মৃতি - ২০০৫ ইংরেজি (২য় প্রকাশ) - ২০০৬ ইংরেজি
- শানে ওয়াইসী (রহ.)-২০০৫ ইংরেজি
- হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চুনতী-২০০৭ ইংরেজি
  ২য় প্রকাশ-২০০৮ ইংরেজি
  ৩য় প্রকাশ-২০০৯ ইংরেজি
- Shan-E-Waisi (Published from India)-2007
- বিশ্বের প্রাচীন জনপদ সফর ১ম খণ্ড (মিশর, জর্দান, ইরাক, ফিলিস্তিন)-২০০৭ ইংরেজি
- Hajj: Omrah: Ziarah-2007
- কালান্তরে দৃষ্টিপাত ৭ম খণ্ড - ২০০৯ ইংরেজি
- ধর্মকথা-১ম খণ্ড-২০০৯ ইংরেজি
- আয়নায়ে দরবারে গারাংগিয়া-২০১১ ইংরেজি
- ওসমানিয় সাম্রাজ্যের দেশ তুরস্ক-২০১১ ইংরেজি
- শানে রাহমতুল্লিল আলমিন (ইসলামিক ফাউন্ডেশন-২০১১ ইংরেজি)
- পারস্য থেকে ইরান-২০১২ ইংরেজি
- ভারতে যেয়ারত ও ভ্রমণ (২য় খন্ড) ২০১২ ইংরেজি
- Turkey: An Osmanian Empire-2012
- শানে ওয়াইসী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)-২০১২ ইংরেজি
- নিষ্প্রাণ ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর-২০১২ ইংরেজি
- চট্টগ্রাম থেকে হজ্বযাত্রী পরিবহন : ইতিকথা-অধিকার-দাবী-২০১৩ ইংরেজি

প্রকাশের পথে

- ইস্তাম্বুল কোনিয়ার পথে প্রান্তরে
- On the way of Istanbul & Konia
- রব্বানা
- ঐতিহ্যের চট্টগ্রাম
- ভারতের যেয়ারত ও ভ্রমণ (৩য় খন্ড)
- বিশ্বের প্রাচীন জনপদ সফর-২ খণ্ড (ইয়েমেন)
- পশ্চিমবঙ্গের আউলিয়ায়ে কেরাম
- ধর্মকথা-২য় খণ্ড
- কালান্তরে দৃষ্টিপাত-৮ম খণ্ড
- চট্টগ্রাম ও ৪৩ - এর দুর্ভিক্ষ
- মানবতা
- ইউরোপ, আমেরিকায় ৬৮ দিন

ভূমিকা : মহান আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে **"চট্টগ্রাম থেকে হজ্বযাত্রী পরিবহন : ইতিকথা-অধিকার-দাবী"** পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হল । এতে পবিত্র মক্কার ও পবিত্র মদিনার সাথে হজ্ব ও যেয়ারত নিয়ে শতশত বছরের নানান যোগাযোগ, যাতায়াত ও অবদানের কথা উল্লেখ রয়েছে।

হজ্বযাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে রাজধানী ঢাকার পাশাপাশি চট্টগ্রামের যে আলাদা অধিকার রয়েছে তার পক্ষে নানান যুক্তি এ পুস্তিকায় উল্লেখ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে সুপ্রিয় পাঠক হয়তো অনেক অজানা বিষয় জানতে পারবেন।

সম্মানিত পাঠক, পুস্তিকাটি পাঠ করলে চট্টগ্রাম থেকে পৃথকভাবে হজ্বযাত্রী প্রেরণের যৌক্তিকতা অনুধাবন করা যাবে আশা করি।

সরকারের উচিত হবে সবকিছু রাজধানী ঢাকাকেন্দ্রিক চিন্তা না করে চট্টগ্রাম বিভাগের হজ্বযাত্রী পৃথকভাবে চট্টগ্রাম থেকে প্রেরণের যৌক্তিক দাবীকে সম্মান ও গুরুত্ব দিয়ে তা কার্যকর করা।

পুস্তিকাটির ১ম প্রকাশ। তথ্য সংগ্রহে, ভাষায়, মুদ্রণে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকবে স্বাভাবিক তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দিয়ে অবগত করালে ২য় প্রকাশে শুধরিয়ে নিতে সচেষ্ট থাকব। পুস্তিকাটি প্রকাশে ও প্রচারে হজ্বযাত্রী কল্যাণ পরিষদ এগিয়ে আসায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

শুভেচ্ছান্তে-
লেখক

প্রারম্ভিক কথা :

ইসলামের প্রারম্ভ থেকে চট্টগ্রামের সাথে সাগরপথে পবিত্র আরবভূমিতে যাতায়াতের ইতিহাস রয়েছে। নবী পাক (স.)'র মহান সাহাবা, তাবিঈ, তাবেতাবিঈগণ পবিত্র আরবভূমি থেকে চট্টগ্রাম হয়ে পূর্বদিকে যাতায়াত করতেন তা ইতিহাস সাক্ষী দেয়। যেহেতু ভৌগোলিক কারণে কর্ণফুলি নদীর ভিতর সেকালের পালতোলা জাহাজগুলোর যাত্রাবিরতি দেয়া সহজতর ছিল। আরবীগণের সংস্পর্শের কারণে চট্টগ্রামের ভাষার মধ্যে আরবী ভাষার সংযোজন রয়েছে। মূলত ভৌগোলিক ও পারিপার্শ্বিক সুবিধার কারণে সেকালে আরবীয়গণ সাগরপথে চীনসহ পূর্বদিকে যাওয়া-আসার পথে মালদ্বীপ, কলম্বো, চেন্নাই, চট্টগ্রামে যাত্রাবিরতি দিতেন তা ইতিহাস থেকে জানা যায়।

ইহা চট্টগ্রামবাসীদের জন্য সুখবর যে, পবিত্র আরবভূমির আরবীগণের সংস্পর্শে চট্টগ্রামবাসীরও সেকালে পবিত্র আরবভূমিতে যাওয়া-আসার পথ সুগম হয়।

ইতিহাস সাক্ষী দেয়- আজ থেকে ৬/৭ শত বছর আগে এখান থেকে চট্টগ্রাম বন্দর শীপইয়ার্ডে নির্মিত জাহাজ মানসম্পন্ন ও টেকসই বিধায় তুর্কী সুলতানগন জাহাজ খরিদ করে নিয়ে যেতেন। এতে প্রতীয়মান হয়, চট্টগ্রাম বন্দর এবং শীপইয়ার্ড -এর মাধ্যমে হাজার হাজার বছর যাবৎ চট্টগ্রামের সাথে বিশ্বের বিভিন্ন বন্দরে দেশের যোগাযোগ পরিচিতি রয়েছে। হজ্ব ইসলামের ফরজ রোকন এবং তা পালনের নিমিত্তে সাহাবা তাবেঈগণের আমল থেকেও ধর্মপ্রাণ চট্টগ্রামবাসী সাগরপথে পালতোলা জাহাজে আরবীগণের সাথে পবিত্র আরবভূমিতে গমন করেছেন হজ্ব পালনের নিমিত্তে তা অস্বীকার করা যাবে না।

এমনিতে সুলতানী আমল থেকে পালতোলা জাহাজে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে হজ্বযাত্রী পরিবহনের কথা ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে।

অর্থাৎ চট্টগ্রামবাসী উদারপ্রাণ, ধর্মপ্রাণ এবং চট্টগ্রাম বন্দরের সুবাদে এ অঞ্চলের বাসিন্দারা শতশত বছর বা তারও আগে থেকে হজ্ব ও জেয়ারতের উদ্দেশ্যে পবিত্র আরবভূমিতে যাতায়াত করে আসতেছে। তা অনেকটা নিশ্চিত করে বলা যাবে।

হজ্বের গুরুত্ব :

হজ্ব একটি ফরজ ইবাদাত। হজ্বের শাব্দিক অর্থ সংকল্প করা। যে ব্যক্তি পবিত্র মক্কায় পৌঁছতে আর্থিক ও শারীরিকভাবে সক্ষম এবং শরীয়তসম্মত কোন প্রতিবন্ধকতা নেই তার উপর হজ্ব ফরজ।

হজ্ব প্রসঙ্গে মহান আল্লাহপাক বলেন, "নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম গৃহ যা মানবমণ্ডলীর জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তা ঐ ঘর যা মক্কায় অবস্থিত। এটি বরকতময় ও বিশ্ববাসীর জন্য পথপ্রদর্শক। তার মধ্যে প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান, মকামে ইবরাহীম উক্ত নিদর্শনসমূহের অন্যতম। আর যে ব্যক্তি এর মধ্যে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করে। আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই গৃহের হজ্ব করা সেসব মানুষের অবশ্য কর্তব্য- যারা শারীরিক ও আর্থিকভাবে ঐ পথ অতিক্রমে সামর্থবান। আর যদি কেউ অস্বীকার করে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসী হতে মুখাপেক্ষীহীন।" (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ৯৬-৯৭)

মহান আল্লাহ পাক আরো বলেন, "আর স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমের (আ.) জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম কাবাগৃহের স্থান। তখন বলেছিলাম আমার সাথে কোন শরীক স্থির করবে না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখো তাদের জন্য যারা তাওয়াফ করে, যারা দাঁড়ায়, রুকু করে এবং সিজদা করে।" (সূরা আল হজ্ব, আয়াত ২৬)

মহান রাব্বুল আলামীন অন্যত্র বলেন, "আর মানুষের নিকট হজ্বের ঘোষণা দাও। তারা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে ও সকল প্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রসমূহের পিঠে, তারা আসবে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে। যাতে তাঁরা তাদের কল্যাণের জন্য উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রিয্ক হিসাবে দান করেছেন তার কারণে নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে। অতপর তোমরা তা হতে ভক্ষণ কর এবং দুস্থ অভাবগ্রস্তদেরকে আহার করাও। অতপর তারা যেন তাদের পরিচ্ছন্নতা দূর করে তাদের মানত পূরণ করে এবং তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের (কাবার)। এটাই বিধান, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলির সম্মান করল তার জন্য সেটি তার প্রতিপালকের নিকট উত্তম।" (সূরা আল হজ্ব, আয়াত : ২৭-৩০)

আল্লাহপাক আরো বলেন, "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নির্দশনসমূহের অন্তর্গত। অতএব যে ব্যক্তি এই গৃহের হজ্ব এবং উমরাহ করে তার জন্য এতদুভয়ের (সাফা-মারওয়া) প্রদক্ষিণ করা দোষনীয় নয়। কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করলে নিঃসন্দেহে আল্লাহ গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞানী।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত ১৫৮)

হজ্বের গুরুত্ব দিয়ে হাদীসে হযরত আবু উমামাহ (র.) হতে বর্ণিত, নবী পাক (স.) ইরশাদ করেন, কোন ব্যক্তি যাকে বাহ্যিক কোন প্রয়োজন কিংবা অত্যাচারী শাসক অথবা দুরারোগ্য ব্যাধি হজ্ব পালনে বাধা দেয়নি, অতপর সে মৃত্যুবরণ করলো অথচ হজ্ব সম্পাদন করেনি, তার মৃত্যু ইয়াহুদী অথবা নাছারা অবস্থায় ইউক। (সুনানু দারেমী)

হযরত আবু হুরায়রা (র.) হতে বর্ণিত নবী পাক (স.) আরও এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্ব সম্পাদন করলো এবং এ সময়ে কোন অশ্লীল কথা কিংবা গুনাহের কাজে লিপ্ত হলো না, সে সদ্যজাত সন্তানের ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে প্রত্যাবর্তন করলো। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

হযরত আবু হুরায়রাহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি নবী পাক (স.) হতে বর্ণনা করেন হজ্ব ও উমরাহ পালনকারী আল্লাহর প্রতিনিধি। তারা আল্লাহর নিকট দোয়া করলে তা কবুল হয় এবং তাঁরা আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা করলে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। (সুনানু ইবনে মাজাহ)

নবী পাক (স.) আরো ইরশাদ করেন, 'যে আমার কবর যেয়ারত করবে তাঁর জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হবে।' নবী পাক (স.) আরো বলেন, 'আমার তিরোধানের পর যে হজ্ব করতঃ আমার কবর যেয়ারতে আসবে, সে যেন জীবিত অবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করল।'

নবী পাক (স.) আরো ইরশাদ করেন, যে হজ্ব করল অথচ আমার যেয়ারত করল না সে আমার সঙ্গে বেয়াদবী করল এবং অবাধ্য রইল। নবী পাক (স.) আরো বলেন, 'যে আমার যেয়ারত করবে সে কেয়ামতের দিন আমার পড়শী হয়ে থাকবে।'

নবী পাক (স.) আরো ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আমার মসজিদে ৪০ ওয়াক্ত নামায ধারাবাহিকভাবে (মাঝখানে কোন ওয়াক্ত বাদ না দিয়ে) পড়বে তাকে আখেরাতে জাহান্নামের আজাব হতে এবং দুনিয়াতে মুনাফেকী নামক ব্যাধি হতে মুক্তি দেয়া হবে।'

উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে প্রত্যক মুসলমান নর-নারী হজ্ব ও যেয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করতে উদগ্রীব থাকে। জীবনে মাত্র একবার গমন তথা হজ্ব করা ফরজ হলেও মুসলমানগণ একাধিকবার যেতে আগ্রহী থাকে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের মধ্যে চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোকজন বারেবারে যেতে খুবই উৎসাহী।

চট্টগ্রাম বন্দর :

সাগরপথে হজ্বযাত্রী পরিবহনে নানান সুযোগ সুবিধা সম্বলিত নৌবন্দর দরকার। চট্টগ্রামে তাও রয়েছে। যদিওবা একালে সাগরপথের চেয়ে আকাশপথে হজ্বযাত্রী পরিবহন নানান অনুকূল অবস্থার কারণে গ্রহণযোগ্যতা বেশি।

শত হাজার বছর আগে থেকে এ চট্টগ্রাম বন্দর হজ্বযাত্রী পরিবহন করে আসছে। আজো নানান আধুনিক অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা নিয়ে আমদানী-রপ্তানির মালামাল পরিবহনে সেবা দিয়ে চলছে এ চট্টগ্রাম বন্দর।

চট্টগ্রাম বন্দর চট্টগ্রামের অহংকার। বিশ্বে চট্টগ্রামকে পরিচিত করার মূল। এ বন্দরের রয়েছে হাজার বছরের ইতিহাস। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বণিকরা এখানে ব্যবসা করতে আসতেন যা তাদের মতে বাণিজ্যিক কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু ও ধন-সম্পদের অবস্থান ছিল। আরবরা এশিয়ার পূর্বদিকে যাওয়া-আসার পথে চট্টগ্রাম বন্দরে অবস্থান করত। আরবের প্রসিদ্ধ পর্যটক ইদ্রিসী ১১৫৩ সালে চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শন করেন এবং চট্টগ্রামকে "কর্ণফূল" নামে আখ্যায়িত করেন।

১৪৫০ সালে চীনের রাষ্ট্রদূত চেংগু চট্টগ্রামে অবস্থান করেন এবং এখানকার অনুকূল আবহাওয়াময় পরিবেশের প্রশংসা করেন। ১৫৩৮ সালে পর্তুগীজরা ৯টি জাহাজ নিয়ে চট্টগ্রাম আসেন এবং এখানে তাদের স্থায়ী মিশন গড়ে তোলেন। অন্য বর্ণনায়, ১৫১৭ সালে ইউরোপীয়ানদের মধ্যে পর্তুগীজরাই প্রথমবার বন্দরে আসে। সুলতান ফখরুদ্দীনের শাসন আমলে প্রখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা চট্টগ্রাম পরিভ্রমণ করেন এবং চট্টগ্রামকে একটি সমৃদ্ধশালী বন্দর ও শহর হিসেবে দেখতে পেয়ে একে 'Saterkon' অভিধায় অ্যাখ্যায়িত করেন। ১৫৬৫ সালে এবং ১৫৭০ সালে পর্যায়ক্রমে ভেনিশ পর্যটক 'মিশিয়া' এবং ফিনিশ পর্যটক কেজার কেড্রিক চট্টগ্রাম ভ্রমণ করেন। তাদের লেখায় জানতে পারা যায় ঐ সময় চট্টগ্রাম বন্দর একটি উন্নয়নশীল বন্দর হিসেবে চিহ্নিত। প্রখ্যাত পর্যটক মিশরি তার ভ্রমণ কাহিনীতে

উল্লেখ করেন যে, লবণভর্তি ২ হাজার জাহাজ চট্টগ্রাম থেকে ইউরোপে রপ্তানি করা হত।

ভারতবর্ষের বাংলা রাজ্যে চট্টগ্রাম একটি সম্পদশালী শহর। ঐ সামুদ্রিক বন্দর প্রাচ্যের সামুদ্রিক বাণিজ্যিক শহরের চাহিদা মিটাত। গৌড় সাম্রাজ্যের প্রবেশদ্বার ছিল চট্টগ্রাম বন্দর।

সুলতানি আমল বা তারও অনেক আগে থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ নির্মাণ কারখানা বা শিপইয়ার্ড ছিল এবং এ শিপইয়ার্ড বিশ্বের অন্যতম সুনামের অধিকারী ছিল কাঠের গুণগত মান এবং নির্মাণশৈলীতে ত্রুটিমুক্ত থাকার কারণে।

১৮৯৮ সালের দিকে বন্দরে বাষ্পচালিত জাহাজের অবস্থান তথা আগমন/প্রস্থান শুরু হওয়ায় পালের জাহাজ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এ বন্দর বিশ্বে দেশকে ব্যবসা-বাণিজ্যে ধারণাতীত সহায়তা তথা আর্থিক যোগান দিয়ে আসছে। দেশের ৮০ শতাংশেরও বেশি পণ্য রপ্তানি হয় এ বন্দর দিয়ে।

এ বন্দর শত শত বছর থেকে হজ্বযাত্রী পরিবহনে সেবা দিয়ে আসছে। আজও এ বন্দর মালামাল আনা-নেয়ার পাশাপাশি হজ্বযাত্রী পরিবহনের অধিকার রাখে। আশা করি, হজ্বযাত্রী পরিবহনে এ বন্দরের শতশত বছরের গৌরবোজ্জ্বল সেবাদানের নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি পুনরায় চালু হবে।

সুলতানি আমল থেকে :

আরবীয়গণের সাথে তাদের পালতোলা জাহাজে করে চট্টগ্রাম থেকে হজ্বযাত্রী যাওয়া-আসা করতেন তা অস্বীকার করা যাবে না, তবে সুলতানি আমলে পালতোলা জাহাজে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে সরকারিভাবে হজ্বযাত্রী পরিবহন হত। ভৌগোলিকভাবে চট্টগ্রামের অবস্থান ভিন্নতায় রয়েছে। ফলে মূল বাংলা থেকে চট্টগ্রামের অবস্থানও ভিন্নতায়। চট্টগ্রাম দখল করতে আরাকান ও ত্রিপুরার রাজাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ হত। অপরদিকে সুলতানি আমলেও বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সুলতানি আমল বা তারও অনেক আগে থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে সাগরে চলাচল উপযোগী বড় বড় পালতোলা জাহাজ নির্মিত হত। যেহেতু চট্টগ্রামের পূর্ব সংলগ্ন পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ভারতের মিজোরাম প্রদেশসহ গভীর অরণ্যের পাহাড়-পর্বতে অসংখ্য মূল্যবান বিরাট বিরাট গাছ থাকাটা স্বাভাবিক। বর্তমানে জনসংখ্যা অধ্যুষিত

হওয়ার পরেও ঐ গভীর অরণ্যে অতি মূল্যবান বিশাল বিশাল কাঠ এখনো ফুরিয়ে যায়নি। যেহেতু কাঠ কেটে কর্ণফুলী নদীপথে নিয়ে আসা সহজতর। অতএব, চট্টগ্রামবাসী চট্টগ্রাম বন্দরের নিকটে সাগর-মহাসাগরে চলাচল উপযোগী জাহাজ তৈরীর কারখানা তথা শিপইয়ার্ড গড়ে তোলে। কাঠের গুণগতমান থাকায় এবং চট্টগ্রামবাসীর নির্মিত এ জাহাজ মজবুত হওয়ায় এর সুনাম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে বিশ্বের বহু দেশে এ জাহাজ বিক্রি হত।

বিশ্বের বিশাল অংশ নিয়ে সাম্রাজ্যের অধিকারী তুর্কি সুলতানগণ চট্টগ্রামের এ শিপইয়ার্ড থেকে জাহাজ খরিদ করে নিয়ে যেতেন তাঁদের নিজস্ব মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া (মিশর তখন তুর্কি সুলতানগণের অধীনে) শিপইয়ার্ড থেকে গুণগতমান অত্যধিক হওয়ার কারণে। শুধু তাই নয়, সুলতান ২য় মুহাম্মদ ইস্তাম্বুল জয় করতে যেসব যুদ্ধজাহাজ ব্যবহার করেছিলেন তা যে চট্টগ্রাম শিপইয়ার্ডে নির্মিত নয় তা বলা যাবে না। অর্থাৎ সুলতান ২য় মুহাম্মদ ইস্তাম্বুল জয়ের যুদ্ধে চট্টগ্রাম শিপইয়ার্ডের জাহাজ ব্যবহৃত হয়েছিল ধরে নেয়া যেতে পারে। যেহেতু তাঁরা চট্টগ্রামের জাহাজকে মানসম্মত মনে করতেন। ঐ সময় কর্ণফুলীর তীরস্থ চট্টগ্রাম শহরের বর্তমান অংশ বিশেষ করে পাথরঘাটা, চাক্তাই, বাকলিয়া, ষোলশহর, চান্দগাঁও, মোহরা ইত্যাদির পুরো অংশ বা আংশিক কর্ণফুলী নদীতে ছিল অর্থাৎ কর্ণফুলী নদী সাগর থেকে ভিতরে এসে এ এলাকায় নদীর প্রশস্ততা বেশ বড় ছিল তা অনায়াসে বুঝা যায়, যদিওবা স্রোতে নদীর দক্ষিণ পাড় ভাঙলেও ১০/১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ নদীর এ এলাকার প্রস্থ যে অনেক বড় ছিল তা সহজে অনুমিত হয়। অতএব, এ এলাকাটি জাহাজ নির্মাণ তথা শিপইয়ার্ডের জন্য সেকালে খুবই অনুকূলে ছিল।

যেখানে চট্টগ্রাম বন্দরে নির্মিত জাহাজ রপ্তানি হত আন্তর্জাতিকভাবে যাতায়াত বা পরিবহনের জন্য সে অবস্থায় চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পালতোলা জাহাজে করে হজ্বযাত্রী গমনাগমনের ইতিহাস সহজে সত্য হিসেবে মেনে নেয়া যায়।

দিল্লীর সুলতানি আমলে সোনারগাঁও এর সুলতান ছিলেন গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ। তাঁর আমলে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে পালতোলা জাহাজে সরকারিভাবে হজ্বযাত্রী পরিবহনের ব্যবস্থা ছিল। ঐ সময় বাংলার দুই বিখ্যাত শহর রাজধানী ঢাকা ও কলকাতার অস্তিত্ব ছিল না। ঢাকা প্রতিষ্ঠা লাভ করে মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের

আমলে। অপরদিকে, কলকাতা শহর প্রতিষ্ঠা লাভ করে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদদৌলার পরাজয়ের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক।

বিহারের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব হযরত মোজাফফর শাহ বলখী (ইনি হযরত ইয়াহিয়া মানেরীর অন্যতম খলিফা) সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের কাছে চিঠি লিখেন তাঁকে যেন চট্টগ্রাম বন্দর থেকে হাজীদের ১ম জাহাজে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

চট্টগ্রামবাসীর ভূমিকা :

চট্টগ্রাম থেকে যেহেতু সুলতানি আমল এবং তারও আগে পালতোলা জাহাজে হজ্বযাত্রী যাতায়াত করে অতএব তাদের বংশধরগণের রক্তপ্রবাহে হজ্ব কার্যক্রমের উপর উৎসাহ থাকা স্বাভাবিক। চট্টগ্রামের বাঘা বাঘা নেতাগণ ব্রিটিশ সরকারের সাথে দেন-দরবার করে, তারা যাতে কলকাতা বন্দর দিয়ে জাহাজ চলাচলে অনুমতি দেয়। এ ভূমিকায় চট্টগ্রামের বাঘা বাঘা নেতাগণের মধ্যে ছিলেন চট্টগ্রামের তখনকার বিভাগীয় কমিশনার খান বাহাদুর এম এ মোমেন এবং অন্যান্যদের মধ্যে আরো রয়েছেন পবিত্র আরবভূমি থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বিশ্বের এতদঞ্চলে আগত মহান হযরত সৈয়দ আবদুর রহমান সিদ্দীকীর (র.) বংশধর চট্টগ্রামের কৃতী পুরুষ আমীরুল হজ্ব খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরী। স্বভাবতই তাঁর রক্তে-মাংসে আল্লাহ পাকের মেহমান হাজীগণের কল্যাণের প্রচেষ্টায় সক্রিয় থাকা স্বাভাবিক। ১৯২৯ ইংরেজির জুনে তিনি এম এল সি নির্বাচিত হন। মুম্বাই বন্দরের পাশাপাশি এ বাংলা থেকে হজ্বযাত্রীরা যাতে কলকাতা বন্দর দিয়ে গমন করতে পারে তার অনুমতি ও সহযোগিতা পেতে দেন-দরবার চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার একটি তদন্ত তথা যাচাই-বাছাই কমিটি গঠন করেন। এতে কমিটির সভাপতি ছিলেন MR. H.B. CLAYTON. খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরীর কাছে ১৫ জুলাই ১৯২৯ ইংরেজি কলকাতা থেকে চিঠি লেখেন কমিটির সেক্রেটারী MR. M.I HUK. তিনি বদি আহমদ চৌধুরীর বরাবরে তার মতামত ও যৌক্তিকতা উপস্থাপন করার জন্য বলেন। এদিকে বদি আহমদ চৌধুরী চট্টগ্রামের অপর কৃতী পুরুষ আবদুল বারী চৌধুরীর (এ কে খানের শ্বশুর) সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন ব্রিটিশ সরকার অনুমতি দিলে তিনি তাঁর শিপিং লাইন থেকে হজ্বযাত্রী পরিবহনে জাহাজ প্রদানে সম্মত থাকার জন্য।

তারপরও ব্রিটিশ সরকার কলকাতা বন্দর দিয়ে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলীয় লোকজন হজ্বে যেতে সম্মতি প্রদানে সহজে রাজি হচ্ছিলনা। অনেক দেন-দরবারের পর ১৯৩৭ ইংরেজিতে ব্রিটিশ সরকার সম্মতি নিয়ে এগিয়ে আসতে বাধ্য হন। ফলে, ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় বঙ্গ (বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ), আসাম, বার্মার (মায়ানমার) হজ্বযাত্রীগণ কলকাতা বন্দর দিয়ে হজ্বে গমন করবেন। মুম্বাই বন্দর দিয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের হজ্বযাত্রীগণ গমন করবেন। সে লক্ষে আবদুল বারী চৌধুরীর ইংলিশতান জাহাজে করে ১৯৩৭ সালে কলকাতা বন্দর দিয়ে হজ্বযাত্রী পরিবহন শুরু হয়। আবদুল বারী চৌধুরীও এ জাহাজে করে হজ্বে গমন করেছিলেন।

আরবীয়গণকে চট্টগ্রামবাসীর আর্থিক সহায়তা :

চট্টগ্রামবাসীর রক্তপ্রবাহে উদারমনে দান করার এবং খাওয়ানোর সুনাম রয়েছে। যুগে যুগে হেজাজবাসীর প্রতিও (সৌদি আরব নামকরণ হওয়ার আগে পবিত্র মক্কা, পবিত্র মদিনা, জেদ্দা অঞ্চল হেজাজ নামে অভিহিত ছিল) তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। অর্থাৎ চট্টগ্রামবাসী সেকালে সাগরপথে হজ্ব করতে গেলে তথায় আরবীয়গণের আর্থিক প্রতিকূলতা দেখে উদারমনে দান করতেন। সেকালে প্রতিকূল যোগাযোগে হজ্বের পর অন্যান্য সময় ওমরাহ ও যেয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করার সংখ্যা খুবই কম হত। শত বছর আগে আকাশপথে যাতায়াত ব্যবস্থা চালু হলেও ঐ পথেও দূরপাল্লার বিমান চালু হয় আরো অনেক পরে। ফলে পবিত্র মক্কা ও পবিত্র মদিনায় হজ্বের পর সমাগম তেমন থাকত না বললেই চলে। পাকিস্তান আমলের মাঝামাঝি সময়ে ইরান খানায়ে খোদা নামকরণে একটি ভিডিও চিত্র তৈরী করেছিল। পাকিস্তান সরকার এটিকে উর্দুতে ডামি করে এদেশে প্রচার করে ১৯৬৮/৬৯ সালের দিকে। তখন হজ্বের পর পবিত্র মক্কার চিত্র দেখিয়ে ছিল। তাতে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল কোন একটি ঘর থেকে একজন আরবীয় বের হয়ে পবিত্র কাবার দিকে যাচ্ছে। আরেকজন সম্মানিত আরবীয় অন্য রাস্তায় হেঁটে হেঁটে অন্যদিকে যাচ্ছে অর্থাৎ বাহিরের লোকজনত নাই-ই। স্থানীয়দের মধ্যে অনেকেই বেকার না থেকে অন্যত্র চলে গেছে বলা যাবে।

হজ্বের পর তথায় তেমন কোন কর্মসংস্থান না থাকায় হেজাজবাসীরা বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় আর্থিক অন্বেষণে ছড়িয়ে পড়তেন। অনুরূপভাবে আরবীয়গণ সাগরপথে এসে এ উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকায় গমন করতেন। তৎমধ্যে চট্টগ্রাম অন্যতম। যেহেতু তাদের কাছে জানা হয়ে গেছে চট্টগ্রামবাসীর দানশীলতার কথা। ব্রিটিশ আমল পেরিয়ে পাকিস্তান আমলের মাঝামাঝি পর্যন্ত পবিত্র

মক্কা, পবিত্র মদিনা থেকে সম্মানিত আরবীয়গণ হজ্বের পর চট্টগ্রাম ঘুরে যেতেন আর্থিক সহায়তা পাওয়ার নিমিত্তে।

তুর্কি ওসমানীয় সুলতানগণ পবিত্র মক্কা ও পবিত্র মদিনাসহ ঐ অঞ্চল শতশত বছর শাসন করে গেছেন। ফলে তুর্কি বলতেই দুই পবিত্র নগরীর প্রতিনিধিত্বকারী বুঝাত। যেমনটা নজদের বর্তমান সৌদিগণকে দুই পবিত্র নগরীর প্রতিনিধিত্বকারী বুঝছি আমরা। তুর্কি ওসমানীয় সালতানাতের তখনকার রাজধানী ইস্তাম্বুলের সাথে দামেস্ক হয়ে বাগদাদ পর্যন্ত রেললাইন ছিল।

দামেস্ক থেকে পবিত্র মদিনা পর্যন্ত ১৪৬৪ কি.মি. এ রেললাইন নির্মাণ করতে গিয়ে আর্থিক সংকটে পড়ে। তখন এ উপমহাদেশের অনেক অঞ্চল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রেরণ করা হয়েছিল। তৎমধ্যে চট্টগ্রাম অন্যতম। দামেস্ক-পবিত্র মদিনা ৩ দিন ৩ রাতের সময়ে তখনকার দুর্বল প্রযুক্তিতে রেল যাতায়াত চালু হয়ে যায়। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, মাত্র ক'বছরের ব্যবধানে ১ম বিশ্বযুদ্ধ ও ওসমানীয় সুলতানের পরাজয়, হেজাজ অঞ্চল হাতছাড়া হয়ে পবিত্র মদিনার সাথে এ রেল সার্ভিস বন্ধ হয়ে তছনছ হয়ে যায়। দুই পবিত্র নগরীর প্রতিনিধিত্বকারী এ ওসমানীয় সুলতানগণ -এর ১ম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিকূলতা দেখে এ উপমহাদেশ থেকে প্রচুর অর্থকড়ি পাঠানো হয়েছিল। এখানেও চট্টগ্রামবাসীর ভূমিকা স্মরণীয়। চট্টগ্রামের বহুবিখ্যাত, স্বনামধন্য পরিবারের মহিলাগণ স্বর্ণ পর্যন্ত প্রেরণ করেছিলেন বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়।

১৯৩০ এর দশকে সৌদি আরবে তেলপ্রাপ্ত হলেও এ আয়ের বড় অংশ বিদেশীদের হাতে চলে যেত। ফলে দুই পবিত্র নগরীসহ সৌদি আরবে আর্থিক প্রতিকূলতা থেকেই যেত। ১৯৩০ এর দশক থেকে সৌদি আরবে গাড়িযোগে যাতায়াত শুরু হলেও তা ছিল মরুভূমিতে বালি সরিয়ে কোনমতে যাতায়াত করা। এমনকি ১৯৪০ এর দশকে বাদশাহ আবদুল আজিজ রিয়াদ থেকে পবিত্র মক্কায় সড়কপথে গাড়িযোগে আসতে বা যেতে ৫/৭ দিন সময় লাগত।

সৌদি আরবে আর্থিক প্রতিকূলতা হেতু পাকিস্তান আমলের মাঝামাঝি সময়ে ১৯৬০-৬১ ইংরেজি পর্যন্ত পবিত্র নগরী থেকে আরবীয়গণ চট্টগ্রামে আর্থিক সহায়তার উদ্দেশ্যে আসতেন। দুই/তিন বা তিন/চারজন গ্রুপ করে অনেক গ্রুপ আসত এ অঞ্চলে। তাদের গায়ে সুতার মোটা কাপড়ে সাদা লম্বা কোর্তা বা জুব্বা থাকত। মাথায় থাকত সাদা লম্বা কাপড়ের পাগড়ী। পায়ে মোটা মজবুত স্যাণ্ডেল বা জুতা, কাঁধে থাকত মোটা সুতার কাপড়ের গাটরি। ঐ গাটরিতে তাদের ব্যবহৃত কাপড়

বাদে কাচের ছোট বোতলে জমজমের পানি, শুকনা খেজুরের কাপড়ে মোড়ানো প্যাকেট, অতি ছোট ছোট কিছু তসবীহ। তারা সাধারণত চট্টগ্রাম শহর পেরিয়ে গ্রামাঞ্চলে যেতেন। গ্রামাঞ্চলে যেতেন বড় বড় বাড়িতে তথা সম্ভ্রান্ত জমিদার বাড়িতে। কোন বাড়িতে গেলে তারা ১/২ দিন থাকতেন। কোন কোন বাড়িতে অবস্থাভেদে ৩/৪ দিনও থাকতেন। ঐ বাড়িতে তাদের জন্য সম্মানের সাথে থাকা-থাওয়ার ব্যবস্থা হত। তাদের রুচির অনুকূলে বিশেষ রান্না হত। তাদের সাথে দেখা করার জন্য, দোয়া নেয়ার জন্য এলাকার লোকজন এসে গিজগিজ করত। যে যার আর্থিক সামর্থ্যমত ১/২ পয়সা থেকে ১/২ টাকা পর্যন্ত দোয়াপ্রার্থী হয়ে সাহায্য করত। আরবীয়গণ কোন একজনের থলে থেকে পবিত্র জমজমের পানির বোতলটি বের করে বড় এক জগ পানির ভিতর কয়েক ফোটা মাত্র জমজমের পানি ফেলতেন। ছোট-বড় সবাই দাঁড়িয়ে অতি সম্মানের সাথে গ্লাসে করে অল্প অল্প জমজমের পানি খাওয়ার জন্য উৎসুক থাকত। মহিলারাও পর্দার আড়ালে থেকে পয়সা-কড়ি দিত। বয়স্ক মহিলারা ব্যবহৃত স্বর্ণ দিয়ে দিত। কয়েক সম্মানী ব্যক্তি দেখলে গাটরি থেকে ১টি শুকনো খেজুর বের করে আঙ্গুল দিয়ে ছিলে প্রত্যেক জনকে ১ টুকরা ১ টুকরা দিতেন। যে বাড়িতে থাকতেন ঐ বাড়ির মালিককে হয়ত একটি তজবীহ দিতেন। বাজার থেকে সাবান কিনে এনে অতি সাবধনতার সাথে পুকুরের ঘাটে কাপড়-চোপড় ধুয়ে শুকাতে দিতেন এবং গোসল করতেন সাবধানে। যেহেতু তাঁরা সাঁতার জানতেন না। তাঁরা বৃহত্তর চট্টগ্রামে অনেক বাড়িতে অবস্থান করে আতিথেয়তা গ্রহণ করতেন এবং যথেষ্ট পরিমাণ অর্থকড়ি পেতেন। উপরোক্ত বর্ণনাটি বাঁশখালীর আমিরুল হজ্ব খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরীর নিকটে আসা এবং অবস্থানকালীন বর্ণনা। প্রতি বছর একাধিক গ্রুপ এ বাড়িতে আসতেন আতিথেয়তার পাশাপাশি আর্থিক সহায়তা পাওয়ার উদ্দেশ্যে

সেকালের দুই পবিত্র নগরীর প্রতি মানুষের অনুভূতি একালের চেয়ে বহু গুণ বেশী ছিল। সেই অনুভূতি ছিল নিষ্কলুষ পরিষ্কার। একালের মত অনুভূতির পাশাপাশি এক বা একাধিক নানান স্বার্থ বা উদ্দেশ্য থাকত না। অর্থাৎ চট্টগ্রামবাসী যুগ যুগ ধরে উদার মনে দুই পবিত্র নগরীর প্রতি আশেক হয়ে উদার মনে খরচ করত।

এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, সৌদি আরব বিশ্বের অন্যতম তেল রপ্তানীকারক দেশ হয়েও তার ন্যায্যমূল্য পেত না। তা নিয়ে যেত বিদেশী তেল উত্তোলনকারীরা। ফলে সৌদি আরবে আর্থিক প্রতিকূলতা থেকে যায়। কিন্তু বাদশাহ আবদুল

আজিজের ২য় পুত্র অসীম সাহসী বাদশাহ ফয়সাল ১৯৭৩ সালে তেল অবরোধ করে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেন। অতপর তেলের অনেকটা নেতৃত্ব কর্তৃত্ব পেয়ে যান এবং তেলের ন্যায্য মূল্য পেয়ে সৌদি আরব দ্রুততার সাথে এগিয়ে যেতে থাকে।

পাহাড়তলীতে স্থায়ী হাজী ক্যাম্প :

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভাগের পর পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তান থেকে (আজকের বাংলাদেশ) সাগরপথে হজ্বযাত্রী পরিবহনে প্রয়োজনের তাগিদে স্থায়ী হাজী ক্যাম্প নির্মাণে দ্রুততার সাথে এগিয়ে আসে। উপমহাদেশ বিভাগের পরবর্তী বছর ১৯৪৮ সালে এ স্থায়ী হাজী ক্যাম্পের নির্মাণ শুরু হয়ে তা নিয়মতান্ত্রিক সময়ের ভিতর শেষ করা হয়। চট্টগ্রাম–ঢাকা মহাসড়ককে সামনে রেখে এ হাজী ক্যাম্প নির্মিত হয়। পাহাড়তলীতে ঢাকা–চট্টগ্রাম রেললাইনের রেলস্টেশন রয়েছে। পাহাড়তলী হয়ে চট্টগ্রামে প্রবেশ করতে হয়। অতএব, সারাদেশের হজ্বযাত্রীরা যাতে রেলে অথবা গাড়িতে করে হাজী ক্যাম্পে পৌঁছতে পারে সে লক্ষে পাকিস্তান সরকার পাহাড়তলীর এ স্থানকে বেছে নিয়েছে তা অনায়াসে বুঝা যায়।

এর অবস্থান তখনকার সময়ে চট্টগ্রাম শহর থকে অনতিদূরে নিরিবিলি পরিবেশে। চট্টগ্রাম শহরকে পাশ কাটিয়ে হজ্বযাত্রীরা যাতে হাজী ক্যাম্প থেকে জাহাজে আরোহণ করতে পারে সে লক্ষে পাহাড়তলীকে বেছে নেয়া হয়। ৯ একর ৩৫ শতকের বিশাল এরিয়া নিয়ে এ হাজী ক্যাম্প। প্রধান ফটক সম্মুখে রেখে বৃহৎ আকারের চত্বর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণ লম্বালম্বি দ্বিতল বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন। এর কিছুটা উত্তরে মহাসড়কের একদম নিকটে একতলা বিশিষ্ট প্রকাণ্ড মসজিদ। মসজিদের পশ্চিমে সংলগ্ন ৮-১০ শতক এরিয়া নিয়ে এলাকাবাসীর সাবেক কবরস্থান। নিয়মতান্ত্রিক দূরত্ব বজায় রেখে হজ্বযাত্রীগণের সাময়িক অবস্থানের নিমিত্তে ৭টি দ্বিতলবিশিষ্ট আবাসিক ভবন। তৎমধ্যে একটি ভবনের সম্মুখভাগে পাহাড়তলী হাজী ক্যাম্প পোষ্ট অফিস। ঐসময় একজন হজ্ব অফিসার, একজন সহকারী হজ্ব অফিসার, কর্মকর্তা-কর্মচারী মিলে প্রায় ১৪/১৫ জন সরকারি লোক কর্মরত থাকত দ্বিতলবিশিষ্ট প্রশাসনিক দালানে। এখান থেকেই সারাদেশের হজ্ব কার্যক্রম পরিচালিত হত। যেহেতু ন্যূনতম কিছু ব্যক্তি আকাশপথে হজ্ব করতে গেলেও এ আকাশপথের হজ্ব কার্যক্রম পরিচালিত হত ঢাকায় নয় করাচিতে। অতএব, পাহাড়তলীর এ স্থায়ী হাজী ক্যাম্প হজ্ব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একমাত্র কেন্দ্রস্থল ছিল। হজ্ব মৌসুমে এখানে অবস্থান করা কোন হাজী ইন্তেকাল করলে এ হাজী ক্যাম্প মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানে দাফন করা হত।

এ পাহাড়তলী হাজী ক্যাম্পে ১৯৪৮ সালে তবলীগ জামাতের ইজতেমার আয়োজন করা হয়েছিল। জানিনা তখন এ বাৎসরিক ইজতেমাকে বিশ্ব ইজতেমার নামধারণ করা হয়েছিল কিনা। তথ্য তালাশে জানতে পারা যায় কাকরাইল মসজিদে ১ম ইজতেমার আয়োজন করা হয় ১৯৪৬ সালে। ১৯৫৮ সালে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে এ ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অংশগ্রহণকারী বাড়তে থাকায় ১৯৬৬ সালে টঙ্গীর তুরাগ -এ ইজতেমা স্থানান্তর করা হয়। পরবর্তীতে সরকার তথায় ১৬০ একর জমি ইজতেমার জন্য বরাদ্দ দেয়।

পাকিস্তান আমল পেরিয়ে বাংলাদেশ আমলে ১৪/১৫ বছর যাবৎ সারা বাংলাদেশের হজ্ব কার্যক্রম এ হাজী ক্যাম্প থেকে পরিচালিত হত এবং তা সাগরপথে হোক বা আকাশপথে হোক।

হজ্ব মৌসুমে হাজী ক্যাম্পের আশেপাশে সৌদি মোয়াল্লেমগণের অফিসাদি, অস্থায়ী দোকানপাট এবং রেষ্টুরেন্ট বসত। অস্থায়ী দোকানপাট বলতে হজ্বযাত্রীগণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী তথা ইহরামের কাপড়, কোমরের বেল্ট, বড়-ছোট ব্যাগ, থলে, স্যান্ডেল, পবিত্র আরবে গিয়ে রান্না করতে নিয়ে যাওয়ার জন্য চাউল, তেল, মসল্লা, টুপি, তসবীহ, আতর ইত্যাদি।

এরশাদ সরকারের আমলে সবকিছু ঢাকাকেন্দ্রিক শুরু হয়ে যায়। তেমনিভাবে রেলের সদর দপ্তরের মত হাজী ক্যাম্পের যাবতীয় কার্যক্রম স্থায়ীভাবে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে যা হবার তাই হল। অর্থাৎ এ অতি মূল্যবান সরকারি সম্পদ বিরানভূমিতে পরিণত হল। দিনে গরু-ছাগলের চারণভূমি, রাতে চোর-ডাকাতের অভয়ারণ্য। এর মধ্যে সরকার প্রয়োজনের তাগিদে এক দালানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, আরেক দালানে প্রশিক্ষণ-এর অফিস করে। অন্য এক দালানে ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল।

৯ একর ৩৫ শতক এর বিশাল অতি মূল্যবান স্থায়ী হাজী ক্যাম্প এরিয়া থেকে ১ একর জায়গা ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে রেজিস্ট্রি দেয়া হয়। এতে দুটি বহুতল ভবন নির্মাণ করা হয়। ২০১০ সালের ১ আগস্ট ধর্ম প্রতিমন্ত্রী এ ভবন দুটির উদ্বোধন করেন।

ভবিষ্যতে এ হাজী ক্যাম্প পুনরায় চালু হবে কি না তা আল্লাহপাক ছাড়া কেউ বলতে পারে না। অতএব সরকারি যথাযথ কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল প্রয়োজনের তাগিদে ১ একর জমি যদি দিতেই হয় তবে তা যেন সরকারি স্থপতি পাঠিয়ে এ বিশাল অতি

মূল্যবান সম্পদের ক্ষতি না হয় মত কোন একপাশে দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা না করে অপরিকল্পিতভাবে এ বিশাল এরিয়ার মাঝামাঝি জায়গায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন- এর দুটি দালান নির্মাণ করা কতটুকু যুক্তিযুক্ত হয়েছে তা ভাববার বিষয়।

সৌদি মোয়াল্লেমগণের আনাগোনা :

ব্রিটিশ আমল এবং পাকিস্তান আমল পেরিয়ে বাংলাদেশ আমলের ১০/১৫ বছর পর্যন্ত হজ্ব করতে তথায় মোয়াল্লেম নির্ধারণ হজ্বযাত্রীগণের ইচ্ছাধীন ছিল। পবিত্র মক্কায় সৌদি নাগরিক মুয়াল্লেমরা হজ্বযাত্রীগণের যাবতীয় কিছু দেখভাল করতেন । তখন একালের মত সরকারি সেবা তথা খবরদারি, নজরদাবি গৌণ ছিল। মুয়াল্লেমগণই মুখ্য ছিলেন । হজ্বযাত্রীগণকে তাদের ঘরে রাখা, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা, পানি সরবরাহের জন্য লোক নিয়োগ করা, মিনা, আরাফাত, মুজদালফায় অস্থায়ীভাবে অবস্থান ও যাতায়াতের ব্যবস্থা মুয়াল্লেমগণ করতেন। তাদের ঘর অনুপাতে হাজী বেশী হলে পার্শ্বস্থ অন্য সৌদি থেকে ঘর ভাড়া নিতেন।

ফলে, পাকিস্তান আমলের শুরু থেকে হজ্বযাত্রী পেতে প্রচারের উদ্দেশ্যে হজ্ব মৌসুমে বা তারও আগে চট্টগ্রামে এসে তাঁরা অবস্থান নিতেন। চট্টগ্রামে তাঁদের মনোনীত ব্যক্তি তথা এজেন্ট থাকতেন ।

মূলত বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত সৌদি নাগরিকত্বপ্রাপ্তগণ থেকে এসব মুয়াল্লেম নিয়োজিত হয়। পাকিস্তান আমলের শেষদিক পর্যন্ত এসব মুয়াল্লেমগণের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন হাছান মুরাদ, ঈসা ছালেহ, আহমদ রমজান, মাতুক কোরবান উল্লেখযোগ্য। মুয়াল্লেমগণ চট্টগ্রাম মহানগরীর স্টেশন রোডস্থ হোটেল মিসকায় অবস্থান নিতেন। দানবীর ইসলাম খান ১৯৫২ সালে এ মিসকা হোটেলের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করেন। তখন চট্টগ্রাম শহরে এ মিসকা ছিল একমাত্র মানসম্পন্ন আবাসিক হোটেল। ইসলাম খানের নাতি চুয়েটের প্রফেসর ড. ইব্রাহীম খান এ মিসকা হোটেল ভেঙ্গে বহুতল ভবন নির্মাণ করতে যাচ্ছেন। ফলে নানান স্মৃতি বিজড়িত এ মিসকা হোটেল হয়ত হারিয়ে যাবে। তার পরেও স্বত্বাধিকারীর প্রতি আবেদন থাকবে মিসকা নামটি যাতে হারিয়ে না যায়।

মুয়াল্লেমগণ চট্টগ্রাম আসলে তাঁরা বিভিন্নভাবে প্রচার চালাতেন হজ্বযাত্রী পাওয়ার নিমিত্তে। চট্টগ্রামে তাঁরা বিভিন্নজনের ঘরে বা বাড়িতে দাওয়াত খেয়ে শেষ করতে পারতেন না। ইহাও চট্টগ্রামবাসীর আতিথেয়তা, উদারতার বহিঃপ্রকাশ।

হজ্ব মৌসুমে মুয়াল্লেমের এজেন্ট তথা প্রতিনিধিগণ পাহাড়তলী হাজী ক্যাম্পে প্রচার চালাতেন। হাজী ক্যাম্পের সম্মুখে মুয়াল্লেমগণের অফিসাদি খোলা হত। এতে তাঁদের এজেন্ট তথা প্রতিনিধিরা বসতেন।

চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর :

চট্টগ্রামে রয়েছে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। এ বন্দর দিয়ে বর্তমানে চট্টগ্রাম-জেদ্দা ফ্লাইট চলাচল করছে। এ ফ্লাইটে করে যাতায়াত করছে একামাওয়ালা তথা চাকুরীজীবীরা ও ওমরাকারীরা। কিন্তু এ বিমান বন্দর দিয়ে অত্র বিভাগের হজ্বযাত্রী পরিবহনে যথাযথ অধিকার লাভ করেনি।

২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার ১৯৪০ সালে যুদ্ধবিমান ওঠা-নামার সুবিধার্থে চট্টগ্রামে এয়ারফিল্ড নির্মাণ করেছিল। এখান থেকে মায়ানমারে (বার্মায়) জাপানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালিত হত। মার্কিন আর্মি এয়ারফোর্স তথা দশম এয়ারফোর্স এ বিমানবন্দরটিকে সাপ্লাই পয়েন্ট এবং সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করত।

চট্টগ্রামে আমেরিকান ইউনিটির কার্যাবলী হল: ৮০তম ফাইটার গ্রুপ ১৯৪৪ সালের মার্চ এবং ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে মায়ানমারের উপর দিয়ে উড্ডয়ন করেছিল। অষ্টম রিকুনাইসেন্স গ্রুপ ১৯৪৪ সালের অক্টোবর হতে ডিসেম্বরের মধ্যে বিভিন্নভাবে পৃথক পৃথক অভিযান চালিয়েছিল।

চতুর্থ কমব্যাট কার্গো গ্রুপ সি-৪৬ কমান্ডে ট্রান্সপোর্টস উড্ডয়ন করেছিল ১৯৪৫ সালের জানুয়ারি হতে জুলাইর মধ্যে। শুধু তাই নয় এ বিমানবন্দর হতে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের জন্য রসদ, অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করত যুদ্ধক্ষেত্রে। যুদ্ধ বন্ধ হলে এ এয়ারপোর্টের নিয়ন্ত্রণ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভাগের পর ইস্পাহানী গ্রুপের 'ওরিয়েন্ট এয়ারলাইন' চট্টগ্রামের সাথে ঢাকার সিভিল এয়ার ক্যারিয়ার চালু হয়। DC-3 Dakota বিমান পরিচালনা শুরু করে। ১৯৫০ সালের পর পি আই এ তথা পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনস গঠিত হয়। ১৯৫৫ সালে ইস্পাহানীর ওরিয়েন্ট এয়ারলাইন্সের কর্তৃত্ব পিআইএ গ্রহণ করে নেয়। পরবর্তীতে পিআইএ ঢাকার পাশাপাশি কক্সবাজারে ফ্লাইট সম্প্রসারিত করে। ইয়াঙ্গুন (রেঙ্গুন) ও কলকাতায় আঞ্চলিক ফ্লাইট পরিচালনা করে।

পাকিস্তান সরকার এ বিমান বন্দরের সম্প্রসারণ, টার্মিনাল ভবন নির্মাণসহ বিমানবন্দরকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর এ বিমানবন্দরকে পরিপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার দাবি উঠে। যেহেতু চট্টগ্রাম বিভিন্ন আমদানী-রপ্তানি শিল্পের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। চট্টগ্রামে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) এর কারণে দেশি-বিদেশি লোকজনের চট্টগ্রামের সাথে বিদেশে যাতায়াতের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যায়। দেশের প্রধান বন্দর চট্টগ্রাম, অতএব আমদানী রপ্তানির প্রয়োজনেও চট্টগ্রাম থেকে বিদেশে যাওয়া-আসা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের অন্যান্য দেশের পাশাপাশি উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্রে চট্টগ্রামের লোকসংখ্যা তুলনামূলক অত্যধিক। কাজেই চট্টগ্রাম থেকে এ উপসাগরীয় আরব দেশসমূহে নিয়মিত ফ্লাইট পরিচালনার প্রয়োজন রয়েছে। তার উপর চট্টগ্রাম থেকে হজ্বযাত্রী পরিবহনত আছেই। হজ্বযাত্রীর পাশাপাশি সারাবছর উমরাহ যাত্রীর সংখ্যাও কম নয়।

এমনিতে যে কোন দেশ একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উপর নির্ভরশীল থাকা উচিত নয় । যে কোন সময় প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন - কুয়াশা, অতিবৃষ্টি, প্লাবিত হওয়া, রানওয়েতে বিমান বিকল হওয়া ইত্যাদি নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থা হতে পারে, যেমনটা ঢাকায় হয়েছিল।

১৯৪১ সালে ২য় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিক বিমান পরিচালনার জন্য ঢাকার উত্তরে তেজগাঁও -এ (তখন বুড়িগঙ্গা নদীর তীর থেকে তেজগাঁও পর্যন্ত ঢাকা শহর সম্প্রসারিত হয়নি) একটি বিমানঘাটি নির্মাণ করে। তার আরো উত্তরে কুর্মিটোলায় আরো একটি বিমানঘাটি নির্মাণ করে। এ বিমান ক্ষেত্র দুটিতে ১৯৪৩ সালে যুদ্ধবিমান উঠা-নামার কার্যাবলী আরম্ভ করে। ১৯৪৬ সালে কলকাতাভিত্তিক ইস্পাহানী ব্রিটিশ বিমানবাহিনীর পাশাপাশি তারা বিমান ওঠা-নামা শুরু করে যাত্রী পরিবহনের নিমিত্তে। ওরিয়েন্ট এয়ারলাইন্স নামকরণে তাদের এ বিমান সংস্থা যাত্রী পরিবহনে তখন বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিল। পাকিস্তান আমলের শুরুর দিকেও বিমান নির্মাণে দুর্বল প্রযুক্তি বিধায় ঢাকা-করাচি ও ঢাকা-লাহোরের ফ্লাইটগুলোকে ভায়া দিল্লী হয়ে যাতায়াত করতে হত। পরবর্তীতে বোয়িং এর মত ভারী বিমান সংগ্রহ করলে পিআইএ ঢাকার সাথে করাচি-লাহোরের সরাসরি ফ্লাইটসহ অন্যান্য স্থানে বিমানের ফ্লাইট সম্প্রসারিত করে তেজগাঁও বিমানক্ষেত্রকে ব্যবহার

করে। সে লক্ষ্যে পাকিস্তান শুরুতেই তেজগাঁও বিমানঘাঁটির রানওয়ে সম্প্রসারণ ও টার্মিনাল ভবন নির্মাণ করে ছোটখাট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এগিয়ে নেয়।

ঢাকা শহর দ্রুত সম্প্রসারিত হওয়ায় এবং তেজগাঁও বিমানবন্দর অপর্যাপ্ত বিধায় পাকিস্তান সরকার কুর্মিটোলা বিমানঘাটির দিকে মনোযোগ দেয়। ১৯৬০ সালের মাঝামাঝিতে এ বিমানঘাটিকে আন্তর্জাতিক মানের বিমানবন্দর নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ফরাসি বিশেষজ্ঞদের কারিগরী সহায়তায় টার্মিনাল বিল্ডিং এবং রানওয়ে নির্মাণের জন্য টেন্ডার আহবান করা হয়। নির্মাণ সামগ্রী পরিবহনের জন্য একটি রেলওয়ে স্টেশন নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে ইহা আধুনিক সুযোগ-সুবিধা পেয়ে প্রয়োজনের তাগিদে এয়ারপোর্ট স্টেশনে উন্নীত।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে এ বিমানবন্দর নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকে এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠালাভের পর সরকার এ বিমানবন্দর নিয়ে প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে। ঠিকাদার ও কনসালটেন্ট ছাড়া কাজ শুরু করতে। তারপরেও সরকার থেমে থাকেনি। যেহেতু শহরের ভিতর বিধায় তেজগাঁও নানা প্রতিকূলতা ছিল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে পরিচালনা করতে। বাংলাদেশ সরকার কুর্মিটোলা বিমানবন্দরের অসম্পন্ন কাজ সম্পন্ন করে ১৯৮০/৮১ সালে উদ্বোধন করে। পরবর্তীতে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে এ বিমানবন্দরকে বিশ্বে একটি প্রথম মানের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে উন্নীত করা হয়।

মূলকথায় ফিরে আসি, এ অঞ্চলের প্রবেশ ও প্রস্থানদ্বার ছিল চট্টগ্রাম। সেহেতু স্থলপথ ও আকাশপথ চালু হয় ২শ বছরের ব্যবধানে। চট্টগ্রাম কেবল দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রবেশ/প্রস্থান দ্বার হিসেবে নয় বরং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রবেশ/প্রস্থানদ্বার হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

সময়ের দাবিতে চট্টগ্রাম বিমানবন্দরকে পরিপূর্ণ আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার নিমিত্তে ১৯৮৯ সাল থেকে এর কার্যক্রম শুরু হয়। এ প্রকল্পের প্রধান আর্থিক সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে জে.বি.সি তথা জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন। তখন এর মোট ব্যয় ধরা হয়েছিল ১ লক্ষ ৫৪ হাজার মার্কিন ডলার তথা ১২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৯৮ সালের ১২ মার্চ তারিখ থেকে এ প্রকল্প কার্যক্রমের যাত্রা শুরু হয়। সর্বমোট নির্মাণ সময় ছিল ৩৩ মাস তথা ২০০০ সালের ১১ ডিসেম্বর। সফলভাবে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়।

ইহা একটি পরিপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের গৌরব লাভ করে। আগে উত্তর পাশে ছোট কলেবরে টার্মিনাল ভবন ছিল। এখন দক্ষিণ পাশে নতুনভাবে নির্মিত চারতলা বিশিষ্ট বিশাল টার্মিনাল ভবন সেবা দান করে চলেছে। ১৮,৬০০০ বর্গমিটার আয়তনের এ টার্মিনাল ভবনের একপাশে আন্তর্জাতিক অন্যপাশে অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের যাত্রীরা যাতায়াত করছে। উপরের তলায় গমন, নিচের তলায় আগমন। বিশ্বের বড় বড় বিমানগুলো এখানে উঠানামা করতে পারে। এ বিমানবন্দরের রানওয়ের দৈর্ঘ্য ২৯৪০ মিটার এবং প্রস্থ ৪৫ মিটার। বিমানবন্দরের একপাশে কার্গো টার্মিনাল রয়েছে। রয়েছে পর্যাপ্ত কার পার্কিং -এর ব্যবস্থা, সাথে আন্তর্জাতিক নিয়মে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাত রয়েছেই।

পতেঙ্গা কর্ণফুলীর মোহনায় সাগর পরিবেষ্টিত এরিয়াটি বেড়ানোর জন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্থান। দেশি-বিদেশি ভ্রমণকারীরা চট্টগ্রাম আসলে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে পতেঙ্গা গমন করে থাকে। নতুন নির্মিত টার্মিনাল ভবন কর্ণফুলীর মোহনার নিকটে হওয়ায় ভ্রমণকারীদের বেড়ানোর ক্ষেত্রে এ মোহনার গুরুত্ব অনেকাংশে বেড়ে গেছে।

চট্টগ্রামে যেহেতু পরিপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রয়েছে অতএব, এ বিভাগের হজ্বযাত্রীদেরকে এ বিমানবন্দর দিয়ে জেদ্দা নেয়া-আনা করা সহজতর।

উভয় পবিত্র শহরে চট্টগ্রামবাসীর অবদান :

চট্টগ্রামের মানুষের রক্তের সাথে পবিত্র মক্কা ও পবিত্র মদিনার আকর্ষণ মিশে থাকবে স্বাভাবিক- মহান সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবেতাবেয়ীনগণের চট্টগ্রামের মাটিতে সাময়িক হলেও সহঅবস্থানের ফলে। তুর্কি আমলেও চট্টগ্রামের বাঘা বাঘা ব্যক্তিরা হজ্ব করতে গেলে তথায় হজ্বযাত্রীগণের স্বার্থে সুযোগ-সুবিধা পেতে দেনদরবার করতেন তুর্কি কর্তৃপক্ষের সাথে। শুধু তাই নয় চট্টগ্রামের মহান দুই দানবীর চাঁন মিঞা সওদাগর ও ইসলাম খান উভয়ে পবিত্র নগরীতে নিজেদের অর্থব্যয় করে দুটি করে মুসাফিরখানা প্রতিষ্ঠা করেন।

পবিত্র মক্কায় চাঁন মিঞা সওদাগরের মুসাফিরখানাটি বেদখল হয়ে যায় দুষ্ট লোকের কারণে। অপরদিকে পবিত্র মক্কার জিয়াদ মহল্লায় ইসলাম খানের মুসাফিরখানাটি ২০০৫ ইংরেজি পর্যন্ত হজ্বযাত্রীরা থাকতে পারতেন বিনা খরচায় (লাইট, পানি, মেরামতের সামান্য খরচ দিয়ে)। কিন্তু এ মুসাফিরখানাটিও পরবর্তীতে অসৎ লোকের হাতে পড়ে বর্তমানে বেদখল বলা চলে। অপরদিকে, পবিত্র মদিনায় ১৯৮৪ সাল

পর্যন্ত চাঁন মিঞা সওদাগরের মুসাফিরখানাটির অবস্থান ছিল সে সময়কার মসজিদে নববী শরীফের পূর্ব-উত্তর কোণায়। এটি ছিল মাটির দেয়াল, খেজুর গাছের বিম দেয়া তিনতলা বিশিষ্ট, যা বর্তমানে মসজিদে নববী শরীফ সম্প্রসারিত হওয়ায় ঐদিকে মহিলাগণের নামাজের এরিয়ায় পড়বে। ইসলাম খানের মুসাফিরখানা চাঁন মিঞা সওদাগরের মুসাফিরখানা থেকে আরো প্রায় ২০০ মিটার মত উত্তর-পূর্বে ছিল। এটিও তিনতলা বিশিষ্ট পাকা দালান।

কিন্তু বাদশা আবদুল আজিজের চতুর্থ পুত্র বাদশা ফাহাদ মসজিদে নববী শরীফ বিশাল আকারে আধুনিকায়নের সাথে সম্প্রসারণ এবং পবিত্র নগরী মদিনাকে নতুনভাবে সাজাতে ১৯৮৫ সালে তাঁর বিশাল প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করে একটানা চালিয়ে নিয়ে ১৯৯৯ সালে সমাপ্ত করেন। এতে শত শত নয় হাজার হাজার দালান কোঠা, পাঁচ তারকা মানের হোটেল ভেঙ্গে ফেলা হয়। এ দু'মুসাফিরখানা যেয়ারতকারীগণের সুবিধার্থে ওয়াকফ্ সম্পত্তি বিধায় সৌদি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কিছুটা দূরত্বে অন্যত্র দুটি বৃহদাকারের মজবুত দালান প্রদান করে। তন্মধ্যে চাঁন মিয়া সওদাগরের মুসাফিরখানা বর্তমান সমপ্রসারিত মসজিদে নববী শরীফ থেকে ৩০০/৪০০ মিটার উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় সাততলা বিশিষ্ট দালান প্রদান করা হয়। এতে লিফট, গরম পানি, ঠাণ্ডা পানি-সহ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা ছিল। অপরদিকে, ইসলাম খানের মুসাফিরখানার জন্য বর্তমান সম্প্রসারিত মসজিদে নববী শরীফ থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় ৬০০-৭০০ মিটার দূরত্বে অনুরূপ একটি দালান প্রদান করা হয়। এ দালানেও আধুনিক সুযোগ সুবিধাসহ লিফট, গরম পানি, ঠাণ্ডা পানির ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু পবিত্র নগরী মদিনা আধুনিকায়নের বৃহত্তর স্বার্থে ২০০৫ সালের পর চাঁন মিঞা সওদাগরের এ মুসাফিরখানা দালানটিও ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং তার বিনিময়ে একটি বড় অংকের তহবিল এ সংক্রান্ত সৌদি যথাযথ কর্তৃপক্ষের ফান্ডে জমা রাখা হয়। পরবর্তীতে এ তহবিল দিয়ে রওজা পাকের দক্ষিণ দিকে বেলাল মসজিদের নিকটে একটি দালান খরিদ করে চাঁন মিঞা সওদাগরের মুসাফিরখানা হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে বলে জানা যায়। অর্থাৎ আজো পবিত্র নগরী মদিনায় চট্টগ্রামের মহান দুই দানবীর চাঁন মিঞা সওদাগর ও ইসলাম খানের মুসাফিরখানায় যিয়ারতকারীগণ স্বল্প খরচে সাময়িক অবস্থান করার সুযোগ পাচ্ছেন।

অপরদিকে, চট্টগ্রামের বাঘা বাঘা সাহসী ব্যক্তিগণ হজ্ব করতে গেলে তথায় বিভিন্ন প্রকল্পে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি সুযোগ-সুবিধার জন্য সৌদি কর্তৃপক্ষের সাথে

দেন-দরবার করতেন। বিশেষ করে আমীরুলহজ্ব খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরীর অবদানটি এখানে স্মরণীয়। তিনি ১৯১৯ ইংরেজিতে তাঁর ফরজ হজ্ব আদায় করেন তুর্কি আমলে। সে বছর হজ্বে আকবর হয়েছিল। ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট মেম্বারও পাশাপাশি হজ্ব কমিটির সদস্য বিধায় আমিরুলহজ্ব হিসেবে হজ্বে গমন করেছিলেন। তখন হজ্বযাত্রীগণের নানান অসুবিধা দেখে তিনি ব্যথিত হন। যেহেতু ১৯২৪/২৫ সালে বাদশাহ আবদুল আজিজ উভয় পবিত্র নগরী দখল করে নেন। ১৯৩২ ইংরেজির ২৩ সেপ্টেম্বর তাঁর দখলকৃত অঞ্চলসমূহ একীভূত করে এক ফরমানের মাধ্যমে তাঁর বংশের নামে সৌদি আরব নামকরণ করেন এবং রাজতন্ত্র প্রবর্তন করেন। তখন রাজতন্ত্রের মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা কঠোর নিয়ন্ত্রণে থাকলেও রাজকীয় সরকারে আর্থিক প্রতিকূলতা বিরাজ করতে ছিল। ফলে পবিত্র মক্কা থেকে পবিত্র মদিনায় যাতায়াত ভাড়া ধারণাতীত বেড়ে যায়। ধূলিঝড়ের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আর্থিক কারণে পানি ছিটানোর বরাদ্দ বাতিল করা হয়। ১৯১৯ সালে তুর্কি আমলে ইঞ্জিন গাড়ি চালু না হলেও ১৯৩৫ সালে এসে যাতায়াতের পাশাপাশি মরুভূমি অঞ্চল বিধায় বালি সরিয়ে গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়। তখন পবিত্র মক্কা থেকে পবিত্র মদিনায় যেতে গাড়িতে ২/৩ দিন লাগত।

খান বাহাদুর সাহেব ইবনে সৌদ তথা বাদশাহ আবদুল আজিজের সাথে দেন-দরবার করে পবিত্র মক্কা থেকে পবিত্র মদিনায় যাতায়াতের ভাড়া কমানোর ব্যবস্থা করেন, পানি ছিটানোর জন্য বাতিল করা বরাদ্দ পুনরায় অনুমোদন করায়ে পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করেন এবং হজ্বের সময় মিনা, মুজদালেফা ও আরাফাতের মসজিদসমূহ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, চুনকাম করার জন্য বাদশাহ আবদুল আজিজের সাথে দেন-দরবার করেন। উভয় পবিত্র নগরীতে হজ্বযাত্রীগণের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে প্রচেষ্টা চালান।

পাকিস্তান আমল :

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভাগের পর সরকারিভাবে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে সাগরপথে হজ্বযাত্রী পরিবহন চালু হয়। সে লক্ষ্যে পাহাড়তলীতে স্থায়ী হাজী ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তখন পূর্ব পাকিস্তানের (আজকের বাংলাদেশ) সমস্ত হাজীরা চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে হজ্বে যাতায়াত করত। আকাশপথের ব্যবস্থা হলে স্বল্প সংখ্যক সচ্ছল হাজী অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে করাচি গমন করে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে করাচি থেকে হজ্বে যাতায়াত করতেন। ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে হজ্বযাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩৮৯৫

জন। পাকিস্তান আমলের শেষের দিকেও প্রতি জাহাজে ২টি ট্রিপ করে চট্টগ্রাম থেকে জেদ্দা হাজী পরিবহন করা হত। ১ম ট্রিপ ছাড়ত রমজানের ঈদের ৬/৭ দিন পর। সে লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তানের এ জাহাজের সমস্ত হজ্বযাত্রী ঈদের একদিন পর চট্টগ্রামের পাহাড়তলী হাজী ক্যাম্পে এসে রিপোর্ট করতেন। তখন চট্টগ্রামে আসার জন্য রেলে এবং অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচলে হাজীদের টিকেট পেতে অগ্রাধিকার ও বিশেষ সম্মানের ব্যবস্থা ছিল। ছফিনা-এ আরব ও ছফিনা-এ-আরাফাত এ দুটি জাহাজ, প্রতি জাহাজে প্রায় ১৩শ' মত হাজী নিয়ে ২ ট্রিপে জেদ্দায় হাজীগণকে পৌঁছে দিত।

হজ্বের পরও ২ ট্রিপ করে জেদ্দা থেকে হাজীগণকে চট্টগ্রাম নিয়ে আসত। প্রায় ৭ শত হাজীর ধারণক্ষমতাসম্পন্ন সামছ (চট্টগ্রাম বন্দর থেকে করাচি বন্দরে নিয়মিত যাত্রী পরিবহনকারী জাহাজ) নামে জাহাজটি চট্টগ্রাম থেকে হাজী নিয়ে করাচি বন্দরে পৌঁছে দিত। করাচি থেকে ৪ হাজার হাজীর ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ছফিনা-এ-হুজাজে করে পূর্ব পাকিস্তানের ৭ শত ও পশ্চিম পাকিস্তানের ৩ হাজার ৩ শত হাজী নিয়ে জেদ্দায় পৌঁছে দিত। এতে প্রতীয়মান হয় চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে প্রায় ৬ হাজার ৫ শত জন থেকে ৭ হাজার হাজী হজ্ব করতেন, করাচি হয়ে আকাশপথে গমন করা স্বল্প সংখ্যক হাজী বাদে। ঐ সময় জাহাজের ডেকে তথা ৩য় শ্রেণীতে আসনের অতিরিক্ত আবেদনকারী থাকায় লটারীর ব্যবস্থা করা হত। জাহাজের ১ম ও ২য় শ্রেণীর ভাড়া অত্যধিক বিধায় কিছু কিছু আসন খালি যেত।

তখন চট্টগ্রাম থেকে হাজীরা যাতে বিড়ম্বনাহীনভাবে আরামে গন্তব্যে পৌঁছতে পারে সে লক্ষ্যে সরকারিভাবে স্থলযোগাযোগে, রেলে টিকেটের ব্যবস্থা এবং পানিপথে বরিশাল, ভোলা অঞ্চলে হাজীগণের যাতায়াতের জন্য সরকারি জাহাজে সিটের/কেবিনের ব্যবস্থা থাকত।

১৯৭০ ইংরেজি পর্যন্ত এ সুন্দর ব্যবস্থাটি চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে চালু ছিল। তখন ডেক তথা ৩য় শ্রেণীর ভাড়া পড়ত ১৯১৯ টাকা। তৎমধ্যে ১০০০ টাকা পবিত্র আরবভূমিতে থাকা-খাওয়া খরচ আর ৯১৯ টাকার মধ্যে খাওয়াসহ জাহাজ ভাড়া এবং সরকারি অন্যান্য আনুসাঙ্গিক খরচ। জাহাজের ২য় শ্রেণীর ভাড়া পড়ত পবিত্র আরব ভূমিতে থাকা, খাওয়াসহ ৪৫০০ টাকার কিছু কম বা বেশী। ১ম শ্রেণীতে সর্বমোট খরচ পড়ত ৭০০০ টাকার কিছুটা বেশী। করাচি থেকে বিমানে ৬০০০ টাকার কিছু বেশী।

ঐ সময় হজ্ব মৌসুমে চট্টগ্রাম শহরে এক আনন্দঘন পরিবেশ বিরাজ করত। হাজীগণের সাথে সমগ্র বাংলাদেশের (তখনকার পূর্ব পাকিস্তান) হজ্বযাত্রীগণের পাশাপাশি তাদের এগিয়ে দিতে নিকটাত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব চট্টগ্রাম শহরে এসে ভীড় জমাতেন। ঐ সময় পাকিস্তান আমলে বর্তমানকালের মত চট্টগ্রামের বাইরের লোকজনের আনাগোনা তুলনামূলক কম ছিল। ফলে সমগ্র চট্টগ্রাম শহরে উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গসহ সারাদেশের লোকজন চট্টগ্রাম শহর ঘুরেফিরে দেখছে তা চট্টগ্রামবাসী অবলোকন করত।

মুক্তিযুদ্ধকালীন :

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ছফিনা-এ-আরব ও ছফিনা-এ-আরাফাত প্রথম ট্রিপ যাওয়ার পর ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ফলে সৌদি বাদশাহ ফয়সালের কাছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ জতিসংঘের জেনেভার মাধ্যমে সৌদি কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লেখেন তথায় অবস্থান করা বাংলাদেশী হজ্বযাত্রীগণকে ফিরে আসতে অনুমতি প্রদানের জন্য। যেহেতু হজ্বযাত্রীগণ পাকিস্তানের নাগরিক এবং পাকিস্তানের পিলগ্রিম পাস (হজ্বযাত্রীগণের বিশেষ পাসপোর্ট) নিয়ে গমন করেছিলেন। কয়েকদিনের মধ্যে উত্তর না আসায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনুরূপ একই পদ্ধতিতে বাদশা ফয়সালের কাছে চিঠির মাধ্যমে অনুরোধ রাখেন পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) থেকে যাওয়া হাজীদের যাতে ফিরে আসতে অনুমতি দেওয়া হয়। সৌদি সরকারের অনুমতি লাভের পর ভারতীয় মুহাম্মদী জাহাজে করে ২ ট্রিপে হাজীদের জেদ্দা থেকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়।

ঐদিকে পবিত্র মক্কায় প্রায় ২৬০০/২৭০০ হজ্বযাত্রী উৎকণ্ঠায় পড়ে যান তারা কিভাবে দেশে ফিরে আসবেন এ নিয়ে। হাজীরা ঘনঘন মুয়াল্লিম অফিস এবং পাকিস্তান হজ্ব মিশনে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকেন কিভাবে দেশে ফিরে আসতে পারেন এ নিয়ে। অবশেষে ভারতীয় মুহাম্মদী জাহাজ জেদ্দার উদ্দেশ্যে যে রওনা হয়ে গেছে তা তারা জানতে পারেন। মুহাম্মদী জাহাজ জেদ্দা পৌঁছলে সৌদি পৃষ্ঠপোষকতায় পাকিস্তান ও ভারতীয় হজ্ব মিশনের যৌথ সহযোগিতায় ১ম ভাগে ছফিনা-ই-আরব জাহাজে গমন করা হাজীগণকে মুহাম্মদী জাহাজে আরোহণের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়।

চট্টগ্রাম বন্দরে অসংখ্য মাইন ও নদীতে জাহাজ ডুবে থাকায় তখন সম্পূর্ণ অনিরাপদ। তখন মুহাম্মদী জাহাজ মংলা বন্দরে প্রবেশের উদ্দেশ্যে সাগরের মোহনায় আসলে ইঞ্জিন বোটে করে বাংলাদেশী যথাযথ কর্তৃপক্ষের লোকজন মোহনায় গিয়ে মুহাম্মদী জাহাজকে মংলা বন্দরের দিকে নিয়ে আসতে থাকে। কিন্তু নাব্যতা স্বল্পতার কারণে এ বিশাল জাহাজ মংলা বন্দরে পৌঁছতে পারে নি। অনেক কষ্টে নদীর ভিতর জাহাজকে ঘোরাতে হয়। ঘুরিয়ে পুনরায় সাগরে এসে চাঁদপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে, হজ্বযাত্রীগণকে গ্রহণ করতে হাজার হাজার নিকটতমজন মংলা গিয়েছিল, তারা চাঁদপুরে ফিরে আসে হাজীগণকে গ্রহণ করতে। অতপর আরেক ট্রিপে ছফিনা-এ আরাফাতের হাজীগণকে এভাবে নিয়ে আসা হয়।

বাংলাদেশ আমল :

১৯৭২ সালে সৌদি আরবের সাথে বাংলাদেশে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না। তারপরেও সৌদি কর্তৃপক্ষ তখন থেকে বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণে হজ্বযাত্রীর যাতায়াতে অনুমতি দেয়। ভারতীয় মুহাম্মদী জাহাজে করে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে হজ্বযাত্রী পরিবহন করা হয়। যেহেতু এরই মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের (বর্তমানে ১২/১৩টি রাষ্ট্র হয়ে ভেঙ্গে গিয়ে রাশিয়ার মূল অংশ বলা যাবে) সহায়তায় চট্টগ্রাম বন্দর মাইনমুক্ত করা হয় এবং নিমজ্জিত জাহাজগুলোকে সরিয়ে ফেলা হয়। অপরদিকে, লটারীর মাধ্যমে ৩০০০ ভাগ্যবান ব্যক্তিকে নির্ধারিত করে বিমানে ঢাকা থেকে হজ্বে প্রেরণ করা হয়।

পরবর্তী বছর ভারতীয় মুহাম্মদী জাহাজ অতি পুরাতন ও দুর্বল বিধায় এটি বাদ দিয়ে মাত্র ৩ হাজার জন হজ্বযাত্রী লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করে ঢাকা থেকে আকাশপথে যাতায়াত চালু রাখা হয়। ১৯৭৬/৭৭ সালে বাংলাদেশ সরকার হিজবুল বাহর নামকরণে একটি জাহাজ ক্রয় করে (যদিওবা এটি পুরাতন এবং ক্রয়ে দুর্নীতির দুর্নাম রয়েছে, এ জাহাজের ধারণক্ষমতা ছিল প্রায় ১৮ শত জনের) ।

চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে ২ ট্রিপে হজ্বযাত্রী পরিবহন করা হয়। এ জাহাজ অন্যসময় অলস বসে থাকায় চট্টগ্রাম থেকে সিঙ্গাপুরে প্রমোদ ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীতে এ জাহাজ বাংলাদেশের নৌবাহিনীকে হস্তান্তর করা হয়। তারা এ জাহাজের নাম পরিবর্তন করে হিজবুল বাহর থেকে শহীদ সালাউদ্দিন করে। নৌবাহিনী ও সরকারের যৌথ নিয়ন্ত্রণে ২/১ বছর হজ্বযাত্রী পরিবহন করার পর জাহাজটি মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে

পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে সীতাকুণ্ড শিপইয়ার্ডে স্ক্র্যাপ হিসেবে কেটে ফেলা হয়।

হজ্ব মৌসুমে ঢাকা থেকে হজ্ব ফ্লাইট পরিচালিত হয় বিধায় ঢাকায় নির্মাণাধীন সরকারি অবকাঠামোকে ঘিরে সম্পূর্ণ অস্থায়ী হাজী ক্যাম্প নির্মাণ করা হয়, যেমনটা ছিল শাহবাগ, তেজগাঁও, আগারগাঁও ইত্যাদি এলাকায়। কিন্তু হজ্ব সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড চট্টগ্রাম পাহাড়তলী হাজী ক্যাম্প থেকে পরিচালিত হত। যেহেতু এখানে স্থায়ী অবকাঠামো ও নানান সুযোগ-সুবিধা রয়েছে।

পাকিস্তান আমলে এমনকি বাংলাদেশ আমলে হিজবুল বাহর জাহাজ যাতায়াতকালে চট্টগ্রামে এক আলাদা ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য বিরাজ করত। পাহাড়তলী হাজী ক্যাম্পে হাজারের অধিক হাজী অবস্থান করা এবং তাঁদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আশপাশের হোটেলে অবস্থান নিয়ে এক ধর্মীয় উৎসব পরিবেশ বিরাজ করত। তখন সারা বাংলাদেশের প্রতি জিলার হজ্বযাত্রীরা হজ্বে গমনের পাশাপাশি চট্টগ্রামকে দেখার জানার ন্যূনতম হলেও সুযোগ হত। যেদিন জাহাজ ছাড়বে ঐ দিন ৮/১০টি রিজার্ভ করা বাসযোগে হজ্বযাত্রীগণকে হাজী ক্যাম্প থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছিয়ে জাহাজে আরোহণের ব্যবস্থা করা হত। সারাদেশের অধিকাংশ হজ্বযাত্রীর সাথে এক বা একাধিক সহযাত্রী হয়ে চট্টগ্রামে আসত যেহেতু তখন বয়স্ক হজ্বযাত্রীর সংখ্যা ছিল বেশী। তারা সবাই চট্টগ্রাম বন্দরে চলে যেত জাহাজ ছাড়ার স্থানে। জাহাজ ছাড়ার দিন সকাল বেলা বৃহত্তর চট্টগ্রামের হাজীগণের নিকটজনরা বিদায় জানাতে চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড় জমাত। চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনেকে নিকটজন হজ্বযাত্রী না থাকলেও আল্লাহপাকের মেহমান হজ্বযাত্রীগণকে বিদায় জানাতে চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড় জমাত।

সাধারণত ৪নং জেটি থেকে (বিশেষ অসুবিধা না হলে) হজ্বযাত্রীর জাহাজ ছাড়া হত। যেহেতু ৪নং জেটি বৃহত্তর পরিসরে খোলামেলা পরিবেশে। সকাল ৯/১০টার মধ্যে সরকারি নিরাপত্তা বাহিনীর ঘেরাও -এর ভিতর দিয়ে আল্লাহপাকের দাওয়াতী মেহমানগণ তথা হাজীগণ জাহাজে আরোহণ করা সমাপ্ত হলে জাহাজের সিঁড়ি তুলে নেয়া হত। অতপর নিরাপত্তা বাহিনীর ঘেরাও উঠিয়ে নিলে হজ্বযাত্রীগণকে বিদায় দিতে আসা হাজার হাজার লোক জাহাজের একদম নিকটে চলে আসত।

সরকারের পক্ষ থেকে ঢাকা থেকে মন্ত্রী এসে হজ্বযাত্রীদের বিদায় জানানোর রেওয়াজ তখনো ছিল। হিজবুল বাহরে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ঢাকা থেকে এসেছিলেন হাজীগণকে বিদায় জানাতে। মুনাজাত এবং বিদায় জানাতে আসা হাজার হাজার

মানবের নারায়ে তাকবির, আল্লাহু-আকবর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হত। জেটি থেকে বাঁধন খুলে দিলে জাহাজ আস্তে আস্তে কর্ণফূলী নদীর মাঝে চলে যেত। অতপর ধীরগতিতে সাগরের দিকে যেতে থাকে। ঐ সময় দেশী-বিদেশী জাহাজগুলো হজ্বযাত্রীবাহী জাহাজকে হুইসেল বাজিয়ে শুভেচ্ছা জানাত। জাহাজ ধীরগতিতে অগ্রসর হয়ে কর্ণফূলী থেকে বঙ্গোপসাগরে পতিত হলে আপন গতিতে জেদ্দার উদ্দেশ্যে চলে যেত।

১৯৭৬ সাল থেকে শুরু হয়ে ৫-৬ বছরের ব্যবধানে হিজবুল বাহর মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও আশির দশকের শুরু পর্যন্ত হজ্বযাত্রীগণের যাবতীয় অফিসিয়াল কাজ হাজী ক্যাম্প থেকে হত। ঢাকা থেকে ফ্লাইট পরিচালনার সুবিধার জন্য অস্থায়ী হাজী ক্যাম্প নির্মিত হত মাত্র ২/১ মাসের জন্য। কিন্তু বাংলাদেশের যাবতীয় হজ্ব কার্যক্রম পরিচালিত হত এ পাহাড়তলী হাজী ক্যাম্প থেকে। এরশাদ সরকারের আমলে ১৯৮৯ সালে এ হজ্ব কার্যক্রম স্থায়ীভাবে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বিপরীতে আশকোনায় স্থায়ী হাজী ক্যাম্প নির্মাণ করে তথায় স্থায়ীভাবে হাজী ক্যাম্পসহ হজ্ব অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়।

মূলত ১৯৪৮ সালে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে হজ্বযাত্রী পরিবহনের সুবিধার্থে পাহাড়তলীস্থ এ হাজী ক্যাম্পের যাত্রা শুরু করা হয়। তখন বলা হত পোর্ট হজ্ব অফিস। একটি বৃহৎ আকারের দ্বিতল ভবনে নির্মিত হয়েছিল প্রশাসনিক অফিস এবং একতলা বিশিষ্ট একটি বিশাল মসজিদ নির্মিত হয়েছিল হজ্বযাত্রীগণ ক্যাম্পে অবস্থানকালে নামায পড়ার জন্য। হজ্বযাত্রার লক্ষ্যে জাহাজ ছাড়ার পূর্বে হাজীরা যাতে কয়েকদিন অবস্থান করে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে পারে সে লক্ষ্যে খোলামেলা পরিবেশে দ্বিতল বিশিষ্ট ভবনগুলি নির্মিত হয়েছিল। মূলত পাকিস্তান আমলে এ পাহাড়তলীতে নানা সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত এ হাজী ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

পাকিস্তান আমল থেকে শুরু করে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত সমস্ত হজ্বযাত্রী সরকারি নিয়ন্ত্রণে হজ্ব করতে যেত। ১৯৭৫-এর শেষের দিকে সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭৬ -এর ৮ জানুয়ারি বাংলাদেশ জেদ্দায় তাঁদের দূতাবাস খোলে। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বরে ফুয়াদ আবদুল হামিদ আল খতিব সৌদি রাষ্ট্রদূত হয়ে ঢাকায় আসেন এবং হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (পরবর্তী নাম শেরাটন বর্তমান রূপসী বাংলা হোটেল, ঢাকায় তখন একমাত্র পাঁচ তারকা হোটেল) অবস্থান নিয়ে তথায় দূতাবাসের কার্যক্রম শুরু করে। তখন থেকে ঢাকাস্থ সৌদি দূতাবাস

খোলাখুলিভাবে চাওয়া মাত্র হজ্ব ভিসা প্রদান শুরু করে দেয়। ফলে অনেকে ট্রাভেলিং এজেন্সীর মাধ্যমে টিকেট ও হজ্ব ভিসা নিয়ে সৌদি আরব গমন করে হজ্ব করত। নিজ উদ্যোগে পবিত্র মক্কায় ও পবিত্র মদিনায় ঘর ঠিক করে অবস্থান করতেন এবং নিজে মুয়াল্লিম ঠিক করে নিতেন। সরকারি ব্যবস্থাপনায় গেলেও জেদ্দা পৌঁছার পর বর্তমানকালের মত কোন নিয়ন্ত্রণ থাকত না। তারাও নিজ উদ্যোগে পবিত্র মক্কায় ও পবিত্র মদিনায় ঘর ঠিক করে অবস্থান নিত। তবে সরকার নিয়ন্ত্রিত হাজীরা বিমানে বা পানির জাহাজে গমন করলে সরকারি সিডিউল মত হাজীদের যাওয়া-আসা করতে হত। ১৯৭৭ ইংরেজির পর ঢাকা-জেদ্দা সৌদি এয়ারলাইন্স ফ্লাইট চালু করলে একালের মত টাকা ইনকামের উদ্দেশ্যে যাতায়াত না থাকায় সৌদি এয়ারলাইন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিত উমরাহ যাত্রী পাওয়ার নিমিত্তে। তখন পাসপোর্ট, ছবি ও বিমান ভাড়া সৌদি এয়ারলাইন্সে জমা দিলে তারাই দূতাবাস থেকে ভিসা নিয়ে যাওয়া-আসার ফ্লাইট ঠিক করে দিত।

২০০১ সাল পর্যন্ত হজ্ব কার্যক্রম এ দুই নিয়মে চলতে থাকে অর্থাৎ সরকারি ব্যবস্থাপনায় এবং বেসরকারি স্বউদ্যোগে। এতে বিশ্বের বহু গরিব দেশের হাজী ঘর ঠিক না করে উভয় পবিত্র নগরীর যেনতেন স্থানে অবস্থান করার প্রবণতা সৃষ্টি হওয়ায় সৌদি সরকার এ নিয়ম পরিবর্তন করে তাতে কঠোরতা আরোপ করে এবং তা হল বেসরকারি এজেন্সী প্রথা এবং সরকারি, বেসরকারি দুই প্রকারের হাজীগণকে উভয় পবিত্র নগরীতে সরকারি অনুমোদিত ঘরে অবস্থান করে হজ্ব করতে হবে। ফলে ২৩/২৪ বছর যাবৎ চলে আসা স্বতন্ত্রভাবে স্বউদ্যোগে হজ্ব করার প্রবণতা বন্ধ হয়ে যায়।

সরকার চট্টগ্রাম-জেদ্দা সপ্তাহে দুটি নিয়মিত বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট চালু রেখেছে। এ ফ্লাইটে প্রবাসীদের পাশাপাশি উমরাহকারীগণও গমনাগমন করে থাকে। হজ্ব মৌসুমে হজ্বযাত্রী পরিবহনের জন্য চট্টগ্রাম-জেদ্দা অতিরিক্ত ফ্লাইট দিয়ে থাকে। কিন্তু তা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল।

ঢাকার সাথে যাতায়াত প্রতিকূলতা :

চট্টগ্রাম-ঢাকা যাতায়াত নানান প্রতিকূলতায় ভরপুর। চট্টগ্রাম-ঢাকা মাত্র ২৭০ কিলোমিটার দূরত্বের সড়কপথ। এরশাদ সরকারের আমলে উন্নয়নের জোয়ার বইতে ছিল। তারই অংশ হিসেবে মেঘনা সেতু এবং দাউদকান্দিতে মেঘনা-গোমতি সেতু

নির্মিত হওয়ায় দীর্ঘ যুগের ফেরী সার্ভিস উঠে যায়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণের অদূরদর্শিতার কারণে সেতু দুটি চারলাইন বিশিষ্ট করা হয়নি। ভবিষ্যতে কাজে আসবে চিন্তা করে রেললাইনের ব্যবস্থা রাখেনি। বর্তমানে এ মহাসড়কের চার লাইন করার কাজ নানা প্রতিবন্ধকতায় কচ্ছপের গতিতে চলছে। চট্টগ্রাম–ঢাকা মহাসড়ক অতুলনীয় অতি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। কিন্তু সরকারগুলোর আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং চট্টগ্রামের দিকে আন্তরিকতার অভাবে এ মহাসড়ক অবহেলিত। এ ২৭০ কিলোমিটার পথ শত শত নয় হাজার হাজার গাড়ীতে ভরপুর থাকে। এ গাড়ীগুলোর মধ্যে বাস, প্রাইভেট গাড়ীর পাশাপাশি অসংখ্য বড় বড় ট্রাক/কাভার্ড ভ্যান চলতে থাকে। এর মধ্যে যদি একটি বিকল হয় কিলোমিটারের পর কিলোমিটার যানজট লেগে যায়। পুরো মহাসড়কে অসংখ্য বাজারে, গাড়ীর স্ট্যান্ডে ভরপুর। ভবিষ্যতে চারলাইন চালু হলেও সুন্দর সুষ্ঠু যান চলাচলের সম্ভাবনা ক্ষীণ।

চট্টগ্রাম–ঢাকা রেল যোগাযোগ সেই ব্রিটিশ আমলের অবস্থায় রয়ে গেছে। ১৯৭২ ইংরেজি থেকে আজ পর্যন্ত দেশের এ অতি গুরুত্বপূর্ণ চট্টগ্রাম–ঢাকা রেল যোগাযোগ সহজতর ও উন্নত করতে কোন সরকার বড় কোন উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়নি। সেই ব্রিটিশ আমলের প্রকল্প লাকসাম থেকে নারায়ণগঞ্জ হয়ে সোজা ঢাকা যাওয়ার লাইনটি বাস্তবায়নে কোন সরকার এগিয়ে আসছেনা।

ফলে সেই ব্রিটিশ আমলের নিয়মে লাকসাম থেকে কুমিল্লা–আখাউড়া–ব্রাহ্মণবাড়িয়া–ভৈরব–টঙ্গী হয়ে ঢাকা যেতে হচ্ছে। ব্রিটিশের গড়া সরু মিটারগেজ তাও আবার একটিই লাইন। অসংখ্য যাওয়া-আসা করা ট্রেনের সাথে সাথে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে শত শত কন্টেইনার -এ লাইন দিয়ে পরিবহন করা হয়। তারপরও কোন সরকারের টনক নড়ছেনা। বড় প্রকল্প হাতে নিয়ে লাকসাম–ঢাকা রেললাইন বাস্তবায়ন করলে মাত্র তিন ঘন্টায় চট্টগ্রাম–ঢাকা যাতায়াত করতে পারবে যা অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। বর্তমানে সড়কপথে হউক রেলপথে হউক, মাত্র ৫/৭ ঘন্টার পথে ন্যূনতম ব্যতিক্রম হলে ১২/১৪ ঘন্টা বা তারো বেশী সময় লেগে যায়।

অতএব, চট্টগ্রাম অঞ্চলের সম্মানিত হজ্বযাত্রীগণের পক্ষে ঢাকায় পৌঁছে যথাসময়ে হজ্ব ফ্লাইট পাওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। অপরদিকে, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবসহ হজ্বযাত্রী ঢাকায় পৌঁছে যথাসময়ে ফ্লাইট না পেয়ে গ্রামাঞ্চলের হজ্বযাত্রীরা অচেনা ঢাকা শহরে নানা বিড়ম্বনার সম্মুখীন হচ্ছেন।

অনুকূলে যুক্তি :

চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে শত শত কোটি টাকার হাজী ক্যাম্প পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এ হাজী ক্যাম্পকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে চট্টগ্রাম বিভাগীয় হজ্ব অফিস করা যেতে পারে। বাংলাদেশে প্রায় প্রত্যেক সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ঢাকার পাশাপাশি বিভাগীয় ও জেলা অফিস রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়েও অফিস রয়েছে। অতএব, চট্টগ্রাম হাজী ক্যাম্পে একটি উপ-হজ্ব অফিস খোলা খুবই সহজ ব্যাপার। নতুন লোকবল নিয়োগ দিয়ে ব্যয় না বাড়িয়ে ধর্ম মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা হজ্ব অফিস থেকে ৫/৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী চট্টগ্রামে বদলী করে উপ-হজ্ব অফিস চালু করা খুবই সাধারণ ব্যাপার।

বর্তমানে প্রতি বছর সোয়া লাখের মত হাজী হজ্ব করতেছে। ফলে, চট্টগ্রাম বিভাগে হজ্বযাত্রীর সংখ্যা ২০/২৫ হাজার হবে অনায়াসে। এ সংখ্যা বছর বছর বাড়ন্ত বাদে কমবে বলে মনে হয় না। চট্টগ্রামে যেহেতু হাজী ক্যাম্প এবং আন্তর্জাতিকমানের বিমানবন্দর রয়েছে, আরও রয়েছে আন্তর্জাতিকমানের নৌ বন্দর। অতএব চট্টগ্রাম থেকে এ বিভাগের হজ্বযাত্রীদের পৃথকভাবে চট্টগ্রাম থেকে জেদ্দা যাতায়াত ব্যবস্থা করা ন্যায়সংগত দাবি।

আমাদের প্রতিবেশী ভারতের রাজধানী দিল্লীর পাশাপাশি মুম্বাই, কলকাতা, চেন্নাই, হায়দারাবাদ, লক্ষ্ণৌ, ত্রিবন্দ্রাম, ভূপাল থেকে হজ্বযাত্রী পরিবহন করা হয়। তদ্রুপভাবে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের পাশাপাশি করাচি, লাহোর, পেশোয়ার থেকে হজ্বযাত্রী পরিবহন করা হয়। বিশ্বে এ রকম বহু দেশে রাজধানীর পাশাপাশি অন্যান্য বড় শহর থেকে হজ্বযাত্রী পরিবহন করা হচ্ছে।

প্রায় সোয়া লক্ষ হজ্বযাত্রী শুধু ঢাকার একটি মাত্র বিমানবন্দর থেকে পরিবহন করতে গিয়ে হজ্বযাত্রীগণকে ঢাকা পৌঁছে যে নানা দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে তা স্পষ্টত প্রতীয়মান। অতএব, সরকারের প্রতি দাবি থাকল- সবকিছুতে ঢাকাকেন্দ্রিক মনমানসিকতা পরিহার করে চট্টগ্রাম থেকে এ বিভাগের হজ্বযাত্রীগণকে পৃথকভাবে যাতে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়। এমনিতে সরকারগুলোর ঢাকাকেন্দ্রিক মনমানসিকতায় চট্টগ্রামবাসীর মনে ক্ষোভ বিরাজ করছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে অন্তত হজ্বযাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে চট্টগ্রামের ন্যায্য দাবির প্রতি যাতে গুরুত্বারোপ করা হয়।

সরকারের বুঝা উচিত চট্টগ্রাম দেশের অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু। ব্যবসা-বাণিজ্যের ৯৩ শতাংশ নিয়ন্ত্রিত হয় চট্টগ্রাম থেকে। অপরদিকে, ৮০ শতাংশেরও বেশী পণ্য রপ্তানি হয় চট্টগ্রাম বন্দরের মধ্যে দিয়ে। মহান আল্লাহ প্রদত্ত ভৌগোলিক অনুকূল অবস্থান সরকারগুলোর পক্ষে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। আবারো বলছি, ব্রিটিশের দিল্লী, পাকিস্তানের পিন্ডি (রাওয়ালপিন্ডি/ইসলামাবাদ) কর্তৃক শোষণ-নিপীড়নের শিকার হয়ে চট্টগ্রামের আলাদা স্বকীয়তা ম্লান হয়ে যায়নি। তা ধরে রাখতে আলাদাভাবে সক্ষম ছিল বলা চলে। কিন্তু ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর সরকারগুলোর সবকিছু ঢাকাকেন্দ্রিক মনমানসিকতার ফসল হিসেবে চট্টগ্রাম আজ ম্লান, চরম অবহেলিত। অতএব, ঢাকার সরকারের প্রতি দাবি থাকবে হজ্বযাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে চট্টগ্রামের যে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ছিল তা যাতে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

- ❑ চট্টগ্রাম পাহাড়তলী স্থায়ী হাজী ক্যাম্পকে উপ-হজ অফিস হিসাবে জরুরী ভিত্তিতে চালু করা হোক।
- ❑ পাহাড়তলী হাজী ক্যাম্পের অবকাঠামোগুলোকে সংস্কার করা হোক।
- ❑ চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে চট্টগ্রাম বিভাগের হজ্ব যাত্রীগণের যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হোক।
- ❑ চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে হজ্বযাত্রী পরিবহনের ব্যবস্থা করে এ বন্দরের শত শত বছরের হজ্বযাত্রী পরিবহনের অবস্থানে ফিরিয়ে আনা হউক।

হজ্বের উপর দরকারী জানা

তালবিয়ার দোয়া :

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ـ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ـ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ـ لاَ شَرِيْكَ لَكَ.

উচ্চারণ : লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা শরীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান নে'মাতা লাকা ওয়াল মূলকা লা শরীকা লাকা।

অর্থ : আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির, আমি হাজির, কোন শরীক নেই তোমার, আর সকল সাম্রাজ্য তোমার । তোমার কোন শরীক নেই।

বি.দ্র. পুরুষগণ জোরে এবং মহিলাগণ আস্তে আস্তে পড়বেন।

হজ্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

হজ্বের প্রকারভেদ : হজ্ব তিন প্রকার : যথা-১। ক্বেরান ২। তামাত্তো ৩। এফরাদ।

১। হজ্বে ক্বেরান :

নিয়ত : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَيَسِّرْهُمَا لِىْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّىْ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি উরিদুল উমরাতা ওয়াল হাজ্জা ফায়াসসিরহুমা লী ওয়াতাকাব্বালহুমা মিন্নী।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি নিশ্চয় ওমরাও হজ্বের আকাঙ্ক্ষা করি, সুতরাং উভয়টাকে আমার জন্য সহজসাধ্য কর ও আমার পক্ষ থেকে কবুল কর।

মীকাতের বাইর থেকে হজ্ব ও ওমরার একসাথে নিয়তসহ এহরাম পরে মক্কা মুকাররামা পৌঁছে ওমরা শেষ করে এহরাম অবস্থায় থেকে হজ্বের সময় হজ্ব করা।

২। হজ্বে তামাত্তো :

নিয়ত : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি উরিদুল হাজ্জা ফায়াসসিরহুলী ওয়াতাকাব্বালহু মিন্নী।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি নিশ্চয় হজ্বের আকাঙ্ক্ষা করি, তুমি আমার জন্য তা সহজসাধ্য কর ও আমার পক্ষ থেকে কবুল কর।

মীকাতের বাইর থেকে প্রথমে শুধু ওমরার নিয়তে এহরাম পরে মক্কা মুকাররামায় পৌঁছে ওমরা শেষ করে এহরামমুক্ত হয়ে স্বাভাবিক নিয়মে হজ্বের জন্য অপেক্ষায় থাকা। হজ্বের সময় হলে পুনঃ হজ্বের নিয়তে এহরাম বেঁধে হজ্ব করা।

৩। হজ্বে এফরাদ :

নিয়ত : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি উরিদুল হাজ্জা ফায়াসসিরহুলী ওয়াতাকাব্বালহু মিন্নী।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি নিশ্চয় হজ্বের আকাঙ্ক্ষা করি, তুমি আমার জন্য তা সহজসাধ্য কর ও আমার পক্ষ থেকে কবুল কর।

মক্কা মুকাররামায় অবস্থানকারী ওখান থেকে আর মীকাতের বাইরের লোকজন মীকাতের বাইর থেকে শুধু হজ্বের জন্য এহরাম পরে মক্কা মুকাররমা পৌঁছে এহরাম অবস্থায় হজ্বের জন্য অপেক্ষা করে হজ্বের সময় আসলে হজ্ব করা।

বি.দ্র: এফরাদ হজ্বের চেয়ে তামাত্তো হজ্ব উত্তম। তামাত্তো হজ্বের চেয়ে ক্বেরান হজ্ব অধিকতর উত্তম।

হজ্বের ফরয :

হজ্বের ৩ ফরজ যথা :

১। হজ্বের উদ্দেশ্যে এহরাম পরা ২। ৯ যিলহজ্ব দুপুর থেকে সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফাতে অবস্থান করা। ৩। ১০ থেকে ১২ যিলহজ্বের মধ্যে কাবা শরীফ তাওয়াফ করা।

হজ্বের ওয়াজিব :

হজ্বের ওয়াজিব ৬টি যথা :

১। সাফা-মারওয়া সায়ী করা ২। ৯ যিলহজ্ব দিবাগত রাত মুজদালিফায় পৌঁছে সোবেহ্ সাদেকের পর কিছুক্ষণ অবস্থান করা ৩। ১০, ১১, ১২ যিলহজ্ব নিয়ম মতে (শয়তানের প্রতি) পাথর নিক্ষেপ (রমি) করা ৪। হজ্বে তামাত্তো ও ক্বেরানকারীগণ দমে শুকরিয়া (হজ্বের কোরবানী) করা ৫। ১০ যিলহজ্ব এহরাম খোলার জন্য মাথা মুণ্ডানো বা চুল কাটা। ৬। মক্কা মুকাররামা থেকে বিদায়কালীন তাওয়াফ (তাওয়াফে সদর) করা।

উল্লেখ্য, ফরয ছেড়ে দিলে হজ্ব হবে না। ওয়াজিব ছেড়ে দিলে দম দিতে হবে।

ওমরার বিবরণ :

কেরান বা তামাত্তো হজ্বযাত্রী হলে হজ্বের অঙ্গ হিসেবে ওমরাহও আদায় হয়ে যায়। এমনিতে হজ্বের সফরে অনেকে পৃথকভাবে ওমরাহ করে থাকেন অধিক ছওয়াব পাওয়ার প্রত্যাশায়।

বর্তমানে হজ্বের সফর ছাড়াও সারা বছর ওমরাহ ও যেয়ারতের নিয়তে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্য নর-নারী পবিত্র আরবভূমিতে গমন করছেন। রমজান মাসে অন্যান্য দেশের পাশাপাশি আমাদের বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার নর-নারী ওমরাহ ও যেয়ারতের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব গমন করছেন। রমজানে এক ওমরাহ এক হজ্বের সওয়াব। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক হজ্বের সাথে সাথে ওমরারও গুরুত্বারোপ করেছেন। হজ্বের পাশাপাশি ওমরাহকারীগণও আল্লাহর সম্মানিত মেহমান। নবী পাক (সা.) এরশাদ করেছেন হজ্ব ও ওমরাহকারীগণ আল্লাহর কাছে যা দোয়া করে তিনি তা কবুল করেন এবং যদি ক্ষমা চান তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।

মী'কাত ও হুদুদে হারম- এর বাহির হতে নিয়ত করে ওমরাহ করা হয়। তবে হুদুদে হারমের বাহির হতে নিয়ত করে ওমরাহ করতে আসার চেয়ে মীকাতের বাহির হতে নিয়ত করে ওমরাহ করতে আসতে পারাটা অধিকতর উত্তম।

ওমরাহ'র নিয়ম :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِىْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি উরিদুল উমরাতা ফায়াসসিরহা লী ওয়াতাকাব্বালহা মিন্নী।
অর্থ : হে আল্লাহ! আমি নিশ্চয়ই ওমরাহ ইচ্ছা করছি। তুমি আমার জন্য তা সহজবোধ্য কর এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল কর।

ওমরাহ'র ফরজ দুইটি :

১। মী'কাত বা হুদুদে হারামের বাহির হতে এহরাম বাঁধা, নিয়ত করা ও তালবীয়া (লাব্বাইক...) পাঠ করা।
২। কাবা শরীফ তাওয়াফ করা।

ওয়াজিব দুইটি :

১। সাফা-মারওয়া সা'য়ী করা।
২। মাথা মুন্ডানো অথবা চুল কাটা।

ওমরাহ পালনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

মীকাত বা হুদুদ হারমের বাহির থেকে এহরাম বেঁধে ওমরার নিয়ত করে তিনবার তালবিয়া (লাব্বাইক...) পড়বেন। অতএব কাবা শরীফ পৌছে সাতবার তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করবেন। এরপর মকামে ইব্রাহীমের পেছনে অথবা মাতাফের অন্য কোন স্থানে ২ রাকআত ওয়াজিবুত্তাওয়াফ নামাজ পড়বেন। অতপর সাফা-মারওয়া সাতবার সায়ী করে মাথার চুল মুন্ডানো অথবা কেটে ওমরাহর আহকাম সমাপ্ত করবেন।

পাচঁদিনব্যাপী হজ্ব কার্যক্রম :

ক্বেরান ও এফরাদ হজ্বযাত্রীগণ মক্কা মুকাররামা পৌঁছে এহরাম অবস্থায় হজ্বের অপেক্ষায় থাকবেন। তামাত্তো হজ্বযাত্রী হলে মক্কা মুকাররামা থেকে মিনায় রওনা হবার আগে হজ্বের নিয়তে এহরাম পরে নিবেন।

৮ জিলহজ্ব : বাদে ফজর রওনা হবেন মক্কা মুকাররামা থেকে প্রায় ৫ কি. মি. পূর্ব-দক্ষিণে মিনায়। ৮ তারিখ যোহর থেকে ৯ তারিখ ফজর পর্যন্ত পরপর এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মিনায় পড়া সুন্নাত এবং তথায় রাত্রি যাপন করাও সুন্নাত ।

৯ যিলহজ্ব : বাদে ফজর মিনা থেকে রওনা হবেন প্রায় ৮ কি. মি. দক্ষিণে আরাফাতের উদ্দেশ্যে। যোহর ও আছর নামাজ আরাফাতে পড়বেন। আরাফাতের মসজিদে নমেরাতে জামাতে নামাজ পড়লে ইমাম সাহেবের পেছনে এক আজান দুই একামতে পরপর ২ রাকাআত করে ২ ওয়াক্তের ৪ রাকাআত কছর (সুন্নাত বাদে) নামাজ পড়বেন। আর তাঁবুতে পড়লে আমাদের হানাফী মাযহাবের নিয়মে পড়বেন।

৯ যিলহজ্ব সূর্য দুপুরে পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময়ের ভিতরে আরাফাতে অবস্থান করা ফরজ। আরাফাত দোয়া কবুলের অন্যতম স্থান। যতটুকু পারা যায় আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া দরুদ পাঠ ও কান্নাকাটি করা চাই।

৯ যিলহজ্ব সূর্য অস্ত যাবার পর আরাফাত থেকে প্রায় ৪ কি. মি. পশ্চিমে মুজদালেফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হবে এবং মুজদালেফায় পৌছে মাগরিব ও এশা (এশা ওয়াক্তে) এক আজানে দুই একামতে পরপর পড়বেন। তারপর মাগরিব ও এশার সুন্নাত পড়বেন। আর মিনায় শয়তানের প্রতি নিক্ষেপ করার জন্য ৪৯টি পাথর মুজদালেফা থেকে সংগ্রহ করে নেবেন। মুজদালেফায় অবস্থান ওয়াজিব। মুজদালেফায় অবস্থান করে ফজরের নামাজ পড়ে কিছুক্ষণ অবস্থান শেষে কিছুটা পশ্চিমে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন।

১০ যিলহাজ্ব : ১। মিনায় পৌঁছে বড় শয়তানের প্রতি ৭টি পাথর নিক্ষেপ ২। তামাত্তো বা ক্বেরান হাজী হলে হজ্বের কুরবানী দমে শুকরিয়া (আর্থিক অক্ষম হলে রোজার ব্যবস্থা আছে) করা। ৩। মাথা মুণ্ডানো বা চুল কাটা (এরপর এহরাম মুক্ত হওয়া) ৪। ১০ যিলহজ্ব থেকে ১২ যিলহাজ্ব -এর মধ্যে মক্কা মুকাররামা গিয়ে (হজ্বের ফরজ রুকন) তাওয়াফে যেয়ারত করা।

১১ যিলহাজ্ব : সূর্য দুপুরে পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লে প্রথমে ছোট তারপর মেজ অতপর বড় শয়তানের প্রতি ৭টি করে পরপর ২১টি পাথর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। ১০ ও ১১ যিলহাজ্ব দিবাগত রাত মিনায় পাথর নিক্ষেপের সময় শুধু-"বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বললে চলবে।

১২ যিলহজ্ব : সূর্য দুপুরে পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লে ১১ যিলহজ্বের নিয়মে তিন শয়তানের প্রতি ২১টি পাথর নিক্ষেপ করে মক্কা মুকাররামার উদ্দেশ্যে সূর্য অস্তের আগে মিনার সীমানা ত্যাগ করবেন।

বি.দ্র : ১২ যিলহাজ্ব মিনায় অবস্থান করে ১৩ যিলহাজ্ব ১১ ও ১২ যিলহজ্বের মত ৩ শয়তানের প্রতি ২১টি কংকর নিক্ষেপ করে মিনা ত্যাগ করা সুন্নাত। কিন্তু ১২ যিলহাজ্ব মিনা ত্যাগ করা প্রচলন হয়ে গেছে। আর মোয়াল্লেমগণও ১২ তারিখ দুপুর থেকে মিনায় তাঁদের ব্যবস্থাপনাও গোটাতে শুরু করেন। অতএব, হজ্ব কার্যক্রমে ১৩ তারিখের কথা তেমন আসে না।